গোলামীর
শিকল ভেঙে
ড. তোয়াহা হুসাইন

মিসরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক

ড. তোয়াহা হোসাইনের অনবদ্য উপন্যাস

গোলামীর শিকল ভেঙ্গে

রফীক আহ্মদ

অনূদিত

ইমদাদ লাইব্রেরী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৯২১২৪০৫৪৪

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১০ ঈ.

গোলামীর শিকল ভেঙ্গে ✡ প্রকাশক : নাজির বিন ইমদাদ
✡ স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত ✡ প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার
✡ কম্পোজ : নাজির বিন ইমদাদ

মূল্য : ১১০ টাকা মাত্র

অর্পণ

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, জামিয়া
ইসলামিয়া কানযুল উলুম
আজমতপুর, নারায়ণগঞ্জ-এর
স্বনামধন্য মুহ্‌তামিম হাফেয
মাওলানা মুফতী আব্দুস সবুর
সাহেব-এর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু
কামনায়-

অনুবাদক

অনুবাদকের কথা

আমরা যে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়েছি, সে ইসলামকে আমাদের পর্যন্ত পৌছাতে গিয়ে যাদের রয়েছে অপরিসীম অবদান, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, নিঃশেষ হয়েছে যাদের টগবগে যৌবন– তারা কারা, কী তাদের পরিচয়, যারা দুনিয়ায় বসে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন? তারা অন্যায় অসত্যের সাথে কখনও আপোস করেননি, তারা জান দিয়েছেন তবুও মান দেননি। রক্ত দিয়েছেন, তবুও ঈমান দেননি। নির্যাতন ভোগ করেছেন, নতিস্বীকার করেননি। তপ্ত লৌহশলাকার ছ্যাকা সয়েছেন, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদ মেনে নিয়েছেন, তবুও তাদের পবিত্র বিশ্বাস থেকে তিল পরিমাণও সরে আসেননি। সেসব মর্দে মুজাহিদের জীবন-চরিত নিয়ে মিসরের খ্যাতনামা লেখক ড. তোয়াহা হোসাইন রচনা করেছেন **আল-ওয়াদুল হক**। আর এরই বাংলা নাম দেয়া হয়েছে 'গোলামীর শিকল ভেঙ্গে...'।

মূল রচনা পড়ে আমি যেমন আবেগাপুত হয়েছি, আশা করি বাংলাভাষাভাষী পাঠকও বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। কেননা এটি গল্পের ঢঙে উপস্থাপিত হলেও এর কাহিনী সবটুকুই সত্যাশ্রয়ী। অনূদিত এ বইটি পড়ে যদি কোনো পাঠকের মনে সাহাবায়ে কেরামের অম্লান স্মৃতি জাগ্রত হয়, আর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিচ্ছবি হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের জীবনকে রাঙিয়ে তুলতে প্রয়াসী হন; তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বিবেচিত হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফিক দিন। আমীন!

রফীক আহমদ

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহিয়ান গরীয়ান সর্বশক্তিমান মহান রাব্বুল আলামীনের। দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর। **গোলামীর শিকল ভেঙ্গে** বইটির মূল রচয়িতা ইসলামী পঠনসামগ্রী পাঠে অভ্যস্থদের অতি পরিচিত মুখ মিসরের ঐতিহাসিক লেখক ড. তোয়াহা হোসাইন। তিনি মজলুম সাহাবায়ে কেরামের জীবনচিত্র কলমের কালিতে ফুটিয়েছেন কাগজের পাতায়। আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা রফীক আহমদ বইটি অনুবাদ করে বাংলাভাষাভাষীদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

বইটি প্রকাশে যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন মহান আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। বইটি নির্ভুল করতে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। তবুও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয়ে আমাদের অবগত করালে ভবিষ্যতে শুধরে নিতে সচেষ্ট থাকবো। মহান আল্লাহ বইটি পাঠ করে আমাদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন।

দুআর মুহতাজ
নাজির বিন ইমদাদ
০১৯২১২৪০৫৪৪

এক.

ইয়াছের বিন আমের তার ভাই মালেক ও হারেছকে বললো, তোমরা ইচ্ছা করলে ইয়ামান প্রদেশে পুনরায় চলে যেতে পার, অথবা অন্য কোথাও চলে যাও। কিন্তু আমি এদেশেই থাকব। এ দেশ আমার কাছে অনেক পছন্দ হয়েছে। আমি অন্য কোন স্থানকে এ স্থানের সমতুল্য মনে করি না। আমি এখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চাই না। তোমরাই বল, আমি কেমন করে যাব? বহু দুঃখ-কষ্ট ও ভয়ভীতির পরে আমি এখানে এসে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছি। অসহায় অবস্থা থেকে সহায় সম্বল লাভ করেছি। নিঃস্ব অবস্থা থেকে স্বচ্ছলতা লাভ করেছি।

তার ভাই মালেক বললো, না, না; বরং একথাই বল যে, আমি এদেশ ছেড়ে কিভাবে যাব? যেহেতু ঐ কালমুখী দাসিটি এখানে আছে।

উত্তরে ইয়াছের বললো– তোমার যা মনে চায় তাই বল, তথাপি আমি এ জায়গা থেকে একটুও নড়ব না। আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি এখানেই অবস্থান করব।

একথা শুনে হারেছ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। দাঁত কিড়মিড় করে বললো, হতভাগা! তোমার উপর লানত'! তুমি স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে থাকতে চাও? কাহতান বংশের চেয়ে মোজার বংশকে ও নিজের আনছ বংশের চেয়ে

কোরায়েশ বংশকে শ্রেষ্ঠ মনে কর। ধিক তোমাকে! খোদার কসম! তুমি এখানে লাঞ্ছিত হবে, বড় মুসিবতে পড়বে। ঘোর বিপদের সময় বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারী তালাশ করে কাউকে পাবে না। কদাচিৎ কাউকে যদি পাও, তবে সে তোমাকে আরও অধিক লাঞ্ছনা দিবে এবং তোমার বিপক্ষেই সাহায্য করবে। ভাল করে ভেবে-চিন্তে দেখ। এখনো সময় আছে।

মালেক আবার ইয়াছেরকে মিষ্টিভাষায় বুঝিয়ে বললো, দেখ, ঐ কালমুখী বাঁদী মক্কার মাটিতে পয়দা হয়নি। আসমান থেকেও টপকিয়ে পড়েনি। অন্য সব গোলাম বাঁদীর মত একেও অন্য জায়গা থেকে আনা হয়েছে। এর মত হাজার হাজার দাসী পথেঘাটে পাওয়া যায়। তুমি যদি এ দাসীকেই চাও, তবে আমরা যেভাবেই হোক না কেন, তাকে সাথে নিয়ে যেতে পারব। তখন তুমি নিজ দেশে আপন ভাই-বন্ধুদের সাথে তোমার প্রেয়সীকে নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করতে পারবে।

ইয়াছের : তোমাদের ইচ্ছা মত তোমরা যা কিছুই বুঝাও না কেন, আমি কিছুতেই এ স্থান থেকে একচুলও নড়ব না। আমি এখানেই থাকব। এদেশকেই আমার স্বদেশ বানাব। আবু হোযাইফা আমার সাথে সদ্ব্যবহার করেছেন, আমি অসৎব্যবহার দ্বারা তার প্রাতিদান দিতে চাই না। তিনি আমার উপকার করেছেন। আমি কি তার ক্ষতি করব? এটা কখনো হতে পারে না। আমি তার মালপত্রের খেয়ানত করতে পারব না। তিনি আমাকে নিজ বড়িতে স্থান দিয়েছেন। আমাকে মেহমানের মত খেদমত করছেন। কত উত্তমভাবে আমাকে স্থান দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, তোমাদের ইচ্ছা হলে তোমরা ইয়ামান দেশে ফিরে যাও। অথবা ইচ্ছা করলে অন্য কোথাও চলে যেতে পার। কিন্তু আমি কখনো এ স্থান ত্যাগ করব না। আমার মনে হচ্ছে, সর্বশক্তিমান বিশ্বপতি আমার দ্বারা এদেশের কোন কাজ করাতে চান।

হারেস উপহাস করে বললো, হ্যাঁ, তোমার দ্বারা গোলামীর কাজই করাতে চান। আর তুমিও এমন জিল্লতি পছন্দ কর। তোমার কার্যকলাপে মনে হয়, তুমি নিজেই জিল্লতিতে নিষ্পেষিত হবে। এ দেশের কেউ যদি নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরে তোমাকে বিপদের সময় সাহায্য করতে অগ্রসর হয়, তাও কোন হালীফের প্রতি যতটুকু করা দরকার তার বেশি হবে না।

এভাবেই তুমি স্থানীয় বন্ধু-বান্ধবের দৃষ্টিতে থাকবে। তুমি নিজে কারো উপর আধিপত্য করতে পারবে না। সর্বদা পরের মুখাপেক্ষী ও তাবেদার থাকবে।

ইয়াছের বিরক্ত হয়ে বললো, ভাই! আমার যা বলার ছিল বলেছি। তোমরা যদি যেতে চাও, যাও। আমি এখানেই থাকব।

হারেছ নিরাশ হয়ে তার ভাই মালেককে বললো, ছেড়ে দাও একে, এর মাথা খারাপ হয়েছে। একে বুঝানো বৃথাশ্রম।

পরদিন ভোরে দুই ব্যক্তিকে আবু হোযাইফার প্রদানকৃত দুটো উট নিয়ে মক্কা থেকে বের হতে দেখা গেল। তাদের সাথে ইয়াছেরও বের হল কিন্তু সফরের উদ্দেশে নয়; বরং ঐ লোক দুইজনকে বিদায় দেয়ার উদ্দেশ্যে। তারা ছিল ইয়াছেরের ভাই মালেক ও হারেছ। এ তিন ভাই মিলে তাদের অপর এক নিরুদ্দেশ ভাইকে খোঁজার জন্য নিজ মাতৃভূমি তেহামায়ে ইয়ামান থেকে বের হয়েছিল। বহুদিন ধরে তারা নানা দেশের জানা-অজানা বিভিন্ন এলাকায় নিখোঁজ ভাইকে তালাশ করে পেল না। বিফল মনোরথ হয়ে অবশেষে তারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে মক্কায় উপস্থিত হল। এই অনুসন্ধানের কাজে তারা দুর্গম পার্বত্য পথে কষ্টসাধ্য ভ্রমণ করে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তারা স্থির করল যে, এখানে (মক্কাতে) কিছুদিন অবস্থান করে ক্লান্তি দূর করবে ও স্থানীয় উপাগণালয়ে গিয়ে দেবতাদের কাছে নিজেদের প্রার্থনা জানাবে। ক্লান্তির দৌরাত্মে বাকি সফরের যা অভাব আছে তা স্থানীয় নেতাদের নিকট ভিক্ষা চেয়ে সংগ্রহ করবে। এমন সিদ্ধান্ত করে তারা মক্কায় অবস্থান করতে লাগল এবং খানায়ে কাবা তাওয়াফ করে সেখানে সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতেও কোন ফল হল না। তারা মক্কার মসজিদে অবস্থান করতে লাগল। কোরায়েশ বংশের লোকেরা সকাল বেলা হেরেমে তাদের পরামর্শ সভায় মিলিত হবে। তারা তাদের অপেক্ষায় থাকল।

পরদিন সকালে দিবালোক চতুর্দিক উদ্ভাসিত হলে আবু হোযাইফা বিন মুগীরা ঐ পথে চলতে গিয়ে হেরেমে এই লোকগুলোকে দেখতে পেল। কোরায়েশ বংশের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তিনি এদেরকে নিজ বাড়িতে

নিয়ে ভালভাবে মেহমানদারী করলেন।

আবু হোযাইফা এই মেহমানদের খাতিরদারীর জন্যে তার যুবতী দাসী সুমাইয়া বিনতে খাইয়াতকে নিযুক্ত করে দিলেন। এই বাঁদীটি যদিও কালো ছিল, কিন্তু যৌবনসুলভ লাবণ্যের দরুন তার চেহারা পাকা আঙ্গুরের আভা ধারণ করে বড়ই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। তার ভাব-ভঙ্গিমা খুবই মনমাতানো। হাত অতি নিপুণ। মাতৃভাষা খাছ আরবী না হলেও তার সুমিষ্ট স্বর কানে মধু বর্ষণ করত। সকালে-বিকালে মেহমানদের খানাপিনা এনে দিত ও অন্য সময় তাদের দেখাশুনা করত। তাদের সাথে অনেক সময় বাক্যালাপ করত। তার কথাবার্তা শুনে অতিথিরা মনে শান্তি লাভ করত। এভাবে ঐ বাঁদী সুমাইয়া ধীরে ধীরে যুবক ইয়াছেরের হৃদয় জয় করে ফেলল। তার প্রেমে পড়ে ইয়াছের মক্কাতে থেকে যেতে বাধ্য হল।

ইয়াছেরের ঐ দুই ভাই উট দুটি নিয়ে মক্কা থেকে তেহামায়ে ইয়ামানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। অতঃপর ইতিহাস তাদের আর কোন খবর দিতে পারেনি। ভাইদের বিদায় দিয়ে ইয়াছের মক্কায় ফিরে এসে আবু হোযাইফার মেহমান হিসাবে অবস্থান করতে লাগল।

দুই.

একদিন আবু হোযাইফা তাদের প্রাতঃমজলিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে মক্কার মসজিদের ধারে ইয়াছিরকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে বললেন, হে আনছ বংশীয় যুবক! তোমার দুই ভাইয়ের খবর কি?

উত্তরে ইয়াছির বললো, তারা বিদেশের তুলনায় স্বদেশকেই অধিক ভালবাসে। তাই স্বদেশে ফিরে গেছে।

আবু হোযাইফা বললেন, তবে তুমি কি স্বদেশ থেকে বিদেশকে বেশি পছন্দ করেছ? আর এ কারণেই বুঝি মক্কায় রয়ে গেছ?

জবাবে ইয়াছির বললো, স্বদেশ-বিদেশ কোন প্রশ্ন নয়। ভয়ভীতি ও ঝগড়া-বিবাদে পরিপূর্ণ মাতৃভূমি থেকে শান্তিপূর্ণ মক্কার হেরেমই আমার কাছে বেশি পছন্দ। আমি মূর্খতা ও অজ্ঞানতার আবাসভূমি ইয়ামান প্রদেশ ছেড়ে পবিত্র কাবাঘরের প্রতিবেশী হয়েছি, এটাই আমার গর্ব।

এবার আবু হোযাইফা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মক্কায় কী কাজ করবে?

ইয়াছির বললো, এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে আমার জীবিকা নির্বাহ করব।

আবু হোযাইফা বললো, তুমি যতদিন আমার নিকট থাকবে, ততদিন তোমাকে জীবিকানুসন্ধান করতে হবে না। তুমি তা আমার কাছেই পাবে।

ইয়াছির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললো, মুহ্তারাম সরদার! এভাবেই

আপনি কুরাইশ বংশীয় মাখযুম গোত্রের গৌরব উজ্জ্বল করবেন। মক্কার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। খোদার কসম! আমি যতদূর জানি, আপনি সকলের প্রিয়পাত্র। আপনি পথহারাকে পথ প্রদর্শন করেন, অভাবীকে সাহায্য করেন, উপবাসীকে অন্ন দান করেন, ভিক্ষুককে অকাতরে দান করেন, মজলুম জনতা আপনার সাহায্য লাভে ধন্য, অনাথ ফকির-মিসকিন, এতিম ও অসহায়দের আপনি আশ্রয়স্থল।

আবু হোযাইফা বললেন, যুবক! থাম, থাম! তুমি তো দেখি আমার প্রশংসায় এক বিশাল সেতু নির্মাণ করে ফেলেছ। তোমার প্রখরবুদ্ধি ও বাকপটুতার পরিচয় আমি আজই পেলাম। আমার ইচ্ছা, তুমি যত দিন এখানে অবস্থান করবে, আমার কাছেই থাকবে।

ইয়াছির : আপনার প্রস্তাব অতি উত্তম। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কিন্তু আমি উভয়কুল রক্ষাকারী সামঞ্জস্যময় এক প্রস্তাব পেশ করতে চাই। এতে আপনার উপর কোন অতিরিক্ত বোঝাও চাপনো হবে না। পক্ষান্তরে আমার দায়িত্বও কমবে না। যেভাবে আপনি নিজ পরিবারবর্গের প্রতিপালন করে থাকেন, তদ্রূপ আমাকে লালন-পালন ও সাহায্য করবেন। এর বিনিময়ে আমি আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করব। যে আপনার সাথে সন্ধি করবে, আমিও তার সাথে সন্ধিসুলভ আচরণ করব। আমি আপনার মিত্রের মিত্র, শত্রুর শত্রু সাজব। সর্বদা আপনার সহচর হয়ে থাকব।

আবু হোযাইফা : তোমার কথা তো হলফে (শপথ করত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া) পরিণত হল।

ইয়াছির : হ্যাঁ, যদি আপনার মর্জি হয়।

আবু হোযাইফা : আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত আছি। আমার কোন দ্বিমত নেই। আগামী দিন আমরা মসজিদে গিয়ে হলফ করব।

ইয়াছির : মসজিদ তো দূরে নয়। আমি আজ যে কাজ করতে পারব, তা আগামীকালের জন্যে ফেলে রাখতে চাই না।

আবু হোযাইফা : তাহলে আস, এখনি চল। এ বলে তিনি ইয়াছিরের হাত ধরে মসজিদের দিকে হাঁটা শুরু করলেন।

মসজিদে প্রবেশ করে তিনি কাবার দিকে যাত্রা করলেন। ইয়াছির পথরোধ করে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

আবু হোযাইফা বললেন, দেবতাগণকে সাক্ষী করতে যাচ্ছি।

যুবক ইয়াছির হেসে বললো, প্রথমে এ লোকগুলোকে সাক্ষী করেন। কেননা তারা চলে যেতে পারে। দেবতারা তো নিজস্থানে বসে আছেন, তারা কোথাও চলে যাবে না।

আবু হোযাইফা : তোমার মত চতুর ও বুদ্ধিমান লোক আমি কখনো দেখিনি।

তারপর তিনি ইয়াছিরকে সাথে নিয়ে কুরাইশদের ঐ মজলিসে উপস্থিত হলেন, যেখানে তিনি ইতোপূর্বে গৃহাভিমুখে ফিরেছিলেন। তিনি সকলকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, কুরাইশ বংশের লোকেরা! আপনারা সকলে সাক্ষী থাকুন, আমি আনছ বংশীয় আমেরের পুত্র এই যুবক ইয়াছিরকে আমার হলিফরূপে গ্রহণ করেছি।

সভার সমস্ত লোক সমস্বরে বলে উঠল, বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। মোবারকবাদ, মোবারকবাদ! আপনার হলিফ বাস্তবেই প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তি।

এভাবে কুরাইশদের সকল মজলিসে একবার ঘুরে পরিশেষে আবু হোযাইফা খানায়ে কাবার দিকে চললেন। ইয়াছির পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

আবু হোযাইফা বললেন, দেবতাগণকে সাক্ষী করতে। এছাড়া আর কোথায় যাব?

ইয়াছির হাসিমুখে বললো, বাহ! আপনি কি মনে করেন, লোকদের নিকট আপনি যে ঘোষণা করেছেন, দেবতারা তা শুনতে পায়নি? নিশ্চয়ই শুনেছে। তারা সাক্ষীও হয়েছে এবং এতে সম্মতও আছে। আমরা কাউকে চুপি চুপি কোন কথা হলে একে অন্যের নিকটবর্তী হয়ে বললে শুনতে পাই। তদ্রুপ দেবতারাও তাদের নিকটে গিয়ে বললে তারা শুনে থাকে। এমন কি আপনার ধারণা?

আবু হোযাইফা কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে উত্তর করলেন, আমার মনে হচ্ছে

আমি আজ এক শয়তানকে আমার হলিফ বানিয়েছি। আনছী যুবক! আমাদের এই দস্তুর যে, আমরা দেবতার নিকট যখন কোন কথা বলি, তখন তাদের একদম কাছে গিয়ে এভাবে দাঁড়াই যেন তাদের সাথে কানে কানে কথা বলছি।

ইয়াছির : এমন কাজের জন্য আপনারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে দাঁড়াতে পারেন। কারণ দেবতাদের তো সর্বত্রই আপনাদের সাথে থাকা বাঞ্ছনীয়।

একথা শুনে আবু হোযাইফা যেন কিছু ভাবনায় পড়ে গেলেন। যুবক তাকে এমন এক কথা স্মরণ করিয়ে দিল যা তার মাথায় ছিল না অথবা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি বিরক্তের সাথে বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না। আমি যে দস্তুর পালনের কথা বলেছি, তা না হলে আমি কিছুতেই রাজি হব না। আমরা খানায়ে কাবা তাওয়াফ করে আমার হলিফের ইজ্জত ও পবিত্রতা পুরোপুরি আদায় করব।

ইয়াছির বললো, চলুন, তাই হবে।

অতঃপর তারা খানায়ে কাবা দুই তিন বার তাওয়াফ করে পরস্পর হলিফ হয়ে ঘরে ফিরল। ঘরে ফিরার পথে আবু হোযাইফা বলতে লাগলেন, আনছী যুবক! একি কথা, আমি দেখছি যে, তুমি অবজ্ঞার সাথে আমাদের দেবতার আলোচনা করে থাক। আর তুমি এদের দেবত্ব অস্বীকার কর বলে মনে হয়। হয়ত তোমার আনছী দেবতাদের কথা তুমি এখনো ভুলতে পারনি। এ কারণে আমাদের উপাস্য দেবতাদের প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হয় না।

ইয়াছির : আপনার প্রতি আমার মা-বাপ কুরবান হোক! খোদার কসম! আমি কখনো আনছি দেবতাদের স্মরণ করিনি যে আজ তাদের ভুলে যাব। তাদের স্মরণ কখনো আমার মনে স্থান পায়নি। আমি দিনে বা রাতে কখনো তাদের নিকট হাজিরা দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। কখনো তাদের কদর করেছি, তাও মনে হয় না।

আবু হোযাইফা বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছ কিংবা নাসারা ও ইহুদি জাতির খোদাকে মানছ।

ইয়াছির : আমি সকল প্রকার লোকের সাথে মেলামেশা করেছি। তাদের

কথাবার্তা ও আলোচনা শুনেছি। কিন্তু কিছুই আমার মনে দাগ কাটেনি। আমি ঐসব বিষয় বুঝার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাও করিনি।

আবু হোযাইফা : তবে কি তোমার কোন মাবুদ নেই?

ইয়াছির : দেখুন সরদার, আমি যদি কাউকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করতাম তবে সাগরকেই করতাম, যার অনন্ত বিস্তৃতি দেখে আমি ভীত ও কম্পিত হই। অথবা সূর্যকে মাবুদ বানাতাম। যে অন্তত লক্ষ দিকে আমাদের আলো দান করে। অথবা নক্ষত্ররাজিকে মাবুদ হিসাবে স্বীকার করতাম যারা রাতে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে। অথবা মেঘমালাকে মাবুদ মানতাম, যার সাহায্যে আমাদের আহার্য ফলাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসবের কোনটাই আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। আমি এখন সত্য সরল পথ হারিয়ে তার সন্ধান করছি। এখনো পাচ্ছি না। সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য লোক সমাজে মেলামেশা করছি নির্লিপ্তভাবে। ধর্মীয় ব্যাপারে আমি সকল থেকে আলাদা।

আবু হোযাইফা : আনছী যুবক! তোমার ব্যাপার খুবই আশ্চর্যজনক।

ইয়াছির : হ্যাঁ জনাব, যেমন অন্যদের। তবে পার্থক্য এই যে, আমি অন্য লোকদের চেয়ে এ বিষয়ে একটু বেশি চিন্তা করে থাকি।

দু'জনে আবু হোযাইফার বাড়িতে পৌঁছে গেল। উভয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে সময় কাটাল। এতে করে আবু হোযাইফার অন্তরে ইয়াছিরের মুহাব্বত গাঢ়ভাবে জমল। তিনি তার পরিবারবর্গকে বললেন, এই অচেনা বিদেশী যুবকের সাথে আমার যেমন মুহাব্বত তৈরি হয়েছে আর কারো সাথে তেমন হয়নি। আমি যদি কাউকে আপন পুত্র হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে এই যুবককে করতাম। ছেলেটি অতি বাকপটু। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল।

তিন.

তার পর থেকে বহুদিন ইয়াছির আবু হোযাইফার অতিথি হিসাবে থকল। সে প্রত্যেক দিন মসজিদে হারামে গিয়ে কুরাইশ বংশের লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করত। দুপুরে ঘরে ফিরে পানাহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করত। তার পর বাজারে গিয়ে লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হত এবং রুজি-রোজগারের অনুসন্ধান করত। অবশেষে রুজিরও একটি উপায় হয়ে গেল আর সে যথেষ্ট উপার্জন করতে লাগল। তখন নিজে বাড়ি তৈরি করে সেখানে বসবাস করার অভিলাস আবু হোযাইফাকে জানাল।

আবু হোযাইফা তাকে বাধা দিলেন না। কিন্তু তিনি ইয়াছিরকে খুবই চিন্তিত দেখলেন। তার মন যেন কোন বিষয় নিয়ে ভাবছে। ইয়াছির আবু হোযাইফার ঘরের চারপাশে অতি হাছরতের সাথে নজর করতে লাগল। এ স্থান ছেড়ে যেতে যেন তার মন চায় না। তা দেখে আবু হোযাইফা জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আনছী যুবক! আজ তোমাকে খুবই বিষণ্ন ও চিন্তিত দেখছি। কারণ কি? আমার ঘরে থাকাকালে তোমার কোন প্রকার তকলীফ হয়েছে কি? এখানে আরো কিছু দিন থাকলে না কেন?

ইয়াছির বললো, খোদার কসম! আপনার গৃহে আমার কোন ধরনের তকলিফ হয়নি। পরন্তু আপনার মেহমানদারীতে আমি খুব আরাম উপভোগ করেছি। আসল কথা এই যে, আপনার ঘরে আমার একটি পছন্দনীয়

জিনিস আছে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তা ব্যতীত আমি সবর-শোকর করে চলতে পারব, দৃষ্টির আড়াল হলে তাকে ভুলে যাব। কিন্তু পরক্ষণে ভেবে দেখলাম যে, তাকে ছাড়া আমার জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়বে।

আবু হোযাইফা অবাক হয়ে বললেন, এ ঘরে তোমার পছন্দনীয় জিনিস কোনটি, তা তো আমার জানা দরকার।

যুবক হেটমুখ হয়ে থাকল, লজ্জায় তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর লাজ-শরমের মাথা খেয়ে সাহস করে বললো, আপনার সুমাইয়া নামক কালো যে বাঁদীটি আছে তার মুহাব্বত আমার হৃদয়-মিনারে বসে গেছে। কিন্তু খোদার কসম! আমি তার প্রতি কোন প্রকার কুদৃষ্টি দিইনি। কোনপ্রকার অন্যায় ব্যবহারও করিনি।

আবু হোযাইফা বললেন, তুমি কি চাও যে আমি তোমাকে ঐ বাঁদীটি দিয়ে দিই?

ইয়াছির : খোদার কসম! আমি আপনার মালে কোন লোকসান করতে চাই না।

আবু হোযাইফা : তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমার মালের কোন ক্ষতি হবে না। সে তো একটি বাঁদী ছাড়া আর কিছু নয়। এমন বাঁদী আমার ঘরে আরো অনেক আছে।

ইয়াছির : আবার বলছি, খোদার কসম! আমি আপনার মালের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে রাজি নই। আমি আপনার অতিথি থাকাকালীন এ জন্যই আপনার হলিফ বনেছিলাম যে, আপনার বোঝা কিছু হলেও হ্রাস করব। আমি তা চাই না যে, আগামী দিনে মাখাযুম গোত্রের লোকেরা বলবে, অমুকের ঘরে একজন অতিথি ছিল। সে যাবার সময় খালি হাতে যায়নি। তার কিছু মালও সাথে নিয়ে গেছে।

আবু হোযাইফা : তুমি যদি চাও তাহলে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিব।

একথা শুনে ইয়াছিরের মুখে হাসি ফুটল। সে বললো, বাহ! আপনি কি চান যে আমি আপনার বাঁদী বিবাহ করে আপনার জন্য গোলাম-বাঁদী জন্ম দিব।

সে সময় আরবদের প্রথানুসারে কেউ কারো গোলাম বাঁদী বিবাহ করে যে

সন্তান জন্ম দিত তারা মনিবের গোলাম-বাঁদী হত।

আবু হোযাইফা এ জবাব শুনে বড়ই খুশি হলেন এবং ইয়ছিরের কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোমার মঙ্গল হোক। আজ তুমি আমাকে কাবু করে ফেলেছ। আচ্ছা আমার বাঁদী সুমাইয়াকে তোমার সাথে বিবাহ দিচ্ছি এবং এটাও ঘোষণা করছি যে, তোমাদের যে সকল সন্তান জন্ম হবে তারা আজাদ হবে।

ইয়াছির : মুহতারাম সরদার! আপনার উপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক! আমি কি বলিনি আপনার দ্বারাই মাখযুম গোত্রের গৌরব উজ্জ্বল হয়েছে এবং আপনার দ্বারাই কুরাইশ বংশের শান বৃদ্ধি হয়েছে? সকল মোয়াজ্জমার ইজ্জত আপনিই চিরস্থায়ী করেছেন।

আবু হোযাইফা বাধা দিয়ে বললেন, থামো, তুমি আমার অনেক প্রশংসা করেছ, আর করতে হবে না। আজ তুমি সন্ধ্যায় আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে শাদি করিয়ে দিব। তার পর তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আপন ঘরে চলে যেও। ইনশাআল্লাহ তোমাদের দাম্পত্য জীবনে অনেক খায়ের ও বরকত হবে।

চার.

ইয়াছির সুমাইয়াকে নিয়ে নিজগৃহে বসবাস করতে লাগল। এরপর বহুদিন ইতিহাসে তার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। নিতান্ত সাধারণভাবে যারা জীবন-যাপন করে, তারা বেঁচে থাক বা মরে যাক, অথবা কোন মুসিবতে নিষ্পেষিত হোক, ইতিহাস তাদের কোনই খোঁজ রাখে না। ইয়াছিরও তেমনি একজন সাধারণ গরীব লোক। কুরাইশদের মধ্যে তার কোন মর্তবা নেই। মক্কাতে তার কোন পরিচয়ও ছিল না। কুরাইশ গোত্রের শাখা গোত্র মাখযুমের একজন বিদেশী হলিফ হিসাবে নিম্নস্তরের গরীব লোকদের ন্যায় সে সাধারণভাবে জীবন-যাপন করত। রাত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কিছু কিছু উপার্জন করত। যেদিন কিছু উপার্জন করতে পারত না, সেদিন তার হলিফ কুরাইশ সর্দারের নিকট কিছু চেয়ে নিজের প্রয়োজন মিটাত। এভাবে সে খুব নিরাপদে শান্তির সাথে জীবন-যাপন করত। নিজের অবস্থার উপর সে সন্তুষ্ট ছিল। কেউ তার উপর কোন প্রকার জুলুম নির্যাতন করত না, কোন ধরনের কষ্টও দিত না।

ইতিহাস সর্বদাই রাজা-বাদশাহ, আমীর-নওয়াব ও বড় সরদার এবং নেতাদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এ কারণে ইতিহাসকে বড় কৃপণ বলা চলে। যেহেতু ইতিহাস কেবল আমীর-ওমারাদের জীবনী যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করে থাকে। আর সরদার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের বিবরণ প্রদান ও

কৃপণতা করে থাকে। বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকদের ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বিবরণ রক্ষা করা ইতিহাসের চিরাচরিত অভ্যাস। এছাড়া অন্য কোন কথা ইতিহাসে নেই। এর জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে এ কুরাইশ বংশের অনেক পুরাতন যুগের ইতহাস খুব কমই পাওয়া যায়। সামান্য ছিটে-ফোঁটা বিবরণ ব্যতীত ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। কালে ইতিহাস এদেরকে অতি নগণ্য জনসমাজ বলে জানত। যাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হয়নি।

রাজা-বাদশাহ, কাইসার-কিসরা ও বড় বড় জাতীয় নেতারাই ইতিহাসে স্থানলাভের অধিকারী ছিল। ইতিহাস যেন ঐ সকল লোকের নিকটই অবস্থান করত। তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হত এবং তাদের জীবনী সযত্নে রক্ষা করত। পক্ষান্তরে কুরাইশ সরদার ও আরবের অন্য গোত্রের রইছগণ লেখাপড়া ও হিসাব-কিতাব বড় একটা জানত না। সময়ের পরিবর্তন ও সমাজের গতি স্রোতের কোন ধার ধারত না। তারা কোন দেশ বা রাষ্ট্রের আধিপত্য লাভ করেনি।

জামানার সকল ঘটনাবলীর আপদ-বালা থেকে আত্মরক্ষা করে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করত। এমন অনুন্নত জাতির লিডার ও সরদারগণকে ইতিহাস সম্মানের চোখে দেখেনি। তাদের কোন বিবরণও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পায়নি। ভবিষ্যৎ বংশধরের মনোযোগ আকর্ষণ ও রুচি বিধানের উপকরণ হিসাবে তাদের সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। যারা বিশেষ কোন ধন-দৌলতের অধিকারী ছিল না। কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করত না। উপাস্য দেব–দেবীর বিষয়ে কিছুই জানত না। বড়লোকদের অনুগ্রহে নিতান্ত নিম্নস্তরের জীবন-যাত্রা নির্বাহ করত। এমন সাধারণ লোকদের তো কোন কথাই নেই।

ইয়াছির এমন গরীব শ্রেণীর লোক ছিল। তাই তার দীর্ঘ জীবনের পূর্ণ ইতিহাস পাওয়ার আশা বিড়ম্বনামাত্র। সে কখন বিদেশ সফর করেছে, কখন ঘরে প্রত্যাবর্তন করেছে– এ ধরনের ক্ষুদ্র বিবরণ পাওয়া যায় না। যাই হোক, অবশেষে এমন এক সময় আসল যখন ইতিহাস তার চিরন্তন কৃপণতা ও গর্ব পরিহার করতে বাধ্য হল।

তখন থেকে ইতিহাস বড় বড় সরদার ও মুখ্য পাত্রের বিবরণদানে যেমন মনোযোগী ছিল, সাধারণ স্তরের লোকদের বিবরণদানে তদপেক্ষা অধিক মনোযোগী হল। এভাবে ইয়াছির ও অন্য সাধারণ লোকদের অবস্থা

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও মাখযুম গোত্রের সরদারগণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্ত ত বিবরণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে লাগল। তখন থেকে সাধারণ ঘটনাবলী ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে লাগল। ঘটনাপ্রবাহ দিন দিন এমন ঘটতে লাগল যে, সাধারণ লোকেরা সচকিত হয়ে গেল। তাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটল। নিজেদের অস্তিত্বের উপলব্ধি করতে শুরু করল। অধিকার জানল ও তা অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে শিখল। কেউ তাতে বিন্দুমাত্র অলসতা করল না। কুরাইশ সরদারগণ দেখতে লাগলেন যে, অবস্থার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। অসহায় ও নিঃস্বল লোকেরা পূর্বে যা চাইত না, জানত না এখন তার আকাঙ্ক্ষা করছে। যে সমস্ত কাজের প্রতি তাদের প্রবৃত্তি ছিল না, এখন তা করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠছে। ইতোপূর্বে যে সকল বিষয় তারা জানত না ও ভাবত না এখন তা আলোচনা করতে আরম্ভ করেছে। দাসেরা আজাদী লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে, আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন দেখছে। স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে। তারা পরস্পর আলোচনা করতে শুরু করেছে যে, জীবন-যাত্রার ব্যাপারে তাদের মনিব সম্প্রদায়ের চেয়ে তাদের অধিকার কম নয়। মানব জীবনের কলুষতা, অপবিত্রতা ও অনাচার থেকে তারা মনিবকুল থেকে বেশি বিমুক্ত। সকলেরই শরীর মাটির তৈরি, পরিণামে সকলেই মাটিতে লয় প্রাপ্ত হবে।

তাদের ও মনিব সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারে কোন ধরনের পার্থক্য নেই। পার্থক্য হয়ে থাকলে তা কেবল জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী হায়াতে হয়ে থাকে। আর এ একটি খেয়ালি অবস্থাও বটে। যে বেশি নেকী অর্জন করে সে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে। যে ভাল কাজ অধিক করে মরণের পর কর্মফলানুসারে সেই মুক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে বেহেশতবাসী হবে।

গোলাম-মনিবের কোন পার্থক্য আল্লাহর দরবারে নেই। যে কেউ বিন্দুমাত্র নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে ও উপযুক্ত প্রতিফল পাবে। আর যে কেউ বিন্দুমাত্র অন্যায় কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে এবং ন্যায্য দণ্ড ভোগ করবে। তারা আরো বলতে লাগল, কোন স্বাধীন ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজ নিজ স্বাধীনতার খাতিরে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পেতে পারে না। অন্তরে অটল ঈমান পোষণ করে খোদাভীতি অবলম্বন করলে, সৎ কাজ করলে এবং নিজ হাত-পা, জিহ্বা ও অন্তর দ্বারা কাউকে কষ্ট না দিয়ে থাকলে শ্রেষ্ঠত্ব হাসিল হয়। কোন গোলাম শুধু তার দাসত্বের দরুন লাঞ্ছিত

ও অপদস্থ হতে পারে না। যদি সে মুমিন, মুত্তাকী হয় এবং তার অন্তর পাপ থেকে পবিত্র থাকে, চরিত্র নিষ্কলুষ হয়, শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব তাদেরই প্রাপ্য। স্বাধীনতা ও গোলামী, ধন-সম্পদ, শালীনতা, গরিবী দুর্বলতা ও শৌর্য-বীর্য মানুষের বাহ্যিক ক্ষণস্থায়ী অবস্থামাত্র। যা কখনো আসে আবার কখনো যায়। এমন সাময়িক ও অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানুষ একে অন্যের উপর ফজিলত লাভ করতে পারে না এবং সমাজনায়ক সাজতে বা রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার অধিকার লাভ করতে পারে না।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে নেক ও সৎ কাজ এবং খোদাভীতি। সমাজের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার বিষয় নয়। কেবল ধন-দৌলত দ্বারাও তা অর্জিত হয় না। জনসাধারণের সন্তুষ্টি ও আস্থাভাজন হতে পারলে তা হাসিল হয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সকল কানুন ও নীতি নাজিল হয়েছে, যার মধ্যে ন্যায় ও অন্যায় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, পাপ-পুণ্যের ধারার পরিষ্কার ব্যাখ্যা আছে, হালাল-হারামের বিষয় স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে, তা-ই হচ্ছে প্রকৃত ও মৌলিক রাষ্ট্রনীতি। পুরাতন দেশাচার যা পুরুষানুক্রমে পাওয়া যায় তা চিরবরেণ্য রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি হতে পারে না। মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে যাবতীয় নীতিরই ক্রমে ক্রমে সংস্কার সাধিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মৌলিক নীতি যা পবিত্র কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা অপরিবর্তনীয় চিরসত্য। ঐ সমস্ত নীতি মেনে চললে ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তির ওয়াদা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। আর অবহেলা করলে ধ্বংস অনিবার্য।

নিম্নস্তরের গরীব শ্রেণীর লোক নিঃস্বম্বল হলিফ ও গোলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখিত ভাবধারার ক্রমবিকাশ হতে লাগল। ঐ শ্রেণীর লোকেরা যেখানেই দুই চারজন মিলিত হত সেখানেই ইত্যাকার আলোচনা করতে আরম্ভ করত। এ সকল আলোচনা কুরাইশ সরদারগণের কানে পৌঁছতে লাগলে তাদের মধ্যেও আলোড়ন শুরু হল। ধন-সম্পদ ও সামাজিক প্রাধান্য-গর্বে গর্বিত তাদের অন্তর হিংসার আগুনে জ্বলে উঠল। তারা ধৈর্যহারা হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল– যেভাবেই হোক, এই ভয়াবহ বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠার পূর্বে নির্বাপিত ও নিষ্পেষিত করে ফেলতে হবে। সমগ্র দেশকে বিদ্রোহানলে ভষ্ম হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত করতে হবে। মক্কার এ সকল ছোট বড় ঘটনাবলীর ও জনসাধারণের আলাপ-আলোচনার প্রতি

ইতিহাসের নজর পড়তে দেখা যায়। মানুষের অন্তরে লুকায়িত ভাবধারা দিন দিন প্রকাশ্য ক্রিয়ায় প্রতিফলিত হতে লাগল।

এ সময় ইয়াছির ও তার স্ত্রী সুমাইয়া প্রায় বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। ইয়াছিরের পৃষ্ঠপোষক হলিফ আবু হোযাইফারও মৃত্যু হয়েছে। সুমাইয়ার গর্ভে ইয়াছিরের তিন পুত্র জন্মেছে। তন্মধ্য হতে একজন কোন এক অজ্ঞাত কারণে মারা গেছে। অপর দু'জন পিতার সাথে দরিদ্র জীবন-যাপন করছে। এই ক্ষুদ্র দরিদ্র ইয়াছির পরিবার মক্কার বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সাথে বিজড়িত বলে ইতিহাসে তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

একদিন দেখা গেল, মক্কার মসজিদে কুরাইশ বংশের মজলিশে খুব উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর নবপ্রচারিত ধর্মের বিষয়ই তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতাবলম্বী গোলাম ও গরীব-দুঃখী লোকদের কথাও তারা অবজ্ঞাভরে সমালোচনা করছিল। কুরাইশ প্রধানদের অন্যতম আরকাম বিন আরকামের ঘরই তদানীন্তনকালে হযরতের প্রচারকেন্দ্র ছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে ভীত ও শংকিত স্বরে কিন্তু অতি চিত্তাকর্ষক ভাষায় প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। কুরাইশগণ সেই ঘরের বিরুদ্ধেও তুমুল আন্দোলন করেছিল।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচার বিষয় অবগত হওয়ার জন্য এখন আরকাম বিন আরকামের ঘরে চলুন। ঘরের দরজায় এক সুগঠন দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ কালো যুবক দণ্ডায়মান। তার মাথা প্রায় ঘরের ছাদ ছুঁই ছুঁই। অপর একজন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নাতিদীর্ঘকায় লোকও সেখানে দণ্ডায়মান। কালো লোকটা গৌরবর্ণ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল– 'হুজুর! কী জন্য এসেছেন?'

গৌরবর্ণ লোকটা উত্তর দিল– 'প্রথমে তুমিই বা কেন এসেছ বল?'

কালো লোকটা বললো, আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু কথাবার্তা শুনতে এসেছি।

অতঃপর উভয়েই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল এবং কিছুক্ষণ হযরতের ওয়াজ শুনে ইসলাম ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করে মুসলমান হল। কালো লোকটা ইয়াছিরের পুত্র আম্মার, আর গৌরবর্ণ লোকটি ছিল সোহাইব বিন সালাম।

পাঁচ.

বার্ধক্যের দরুন ইয়াছিরের শরীরে শক্তি-সামর্থের অভাব ঘটেছে। তার জ্ঞানশক্তি হ্রাস পেতে লেগেছে। মেজায খিটখিটে ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে নিজেই নিজেকে ঘৃণা করে। তার বিবি সুমাইয়াও তার প্রতি বীতরাগ হয়ে পড়েছে। কারণ তার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, মক্কার বালুকাময় প্রান্তরে ও প্রস্তরময় পর্বতগাত্রে প্রভাত সূর্যের কিরণ প্রতিভাত হওয়ার সাথে সাথেই সে শয্যা ত্যাগ করে। সারাটা দিন নিজেও শান্তিতে থাকে না, ঘরের অন্য কাউকেও শান্তিতে থাকতে দেয় না। কখনো এদিকে কখনো ওদিকে দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘোরাফেরা করে, শান্তভাবে বসে বিশ্রাম করে না। নিজে নিজেই নানা কথা বলে বেড়ায়, যেমনটা কোন বিকৃতমস্তিষ্ক লোক করে থাকে। ইয়াছিরের এমন চাল-চলনে তার ঘরের লোকেরাও পেরেশান। তারা মনে মনে তার প্রতি খুবই বিরক্ত।

কোন কোন সময় সে বিরক্তমুখে প্রকাশ করে বলে বসে এবং তাকে চুপ করে বসে থাকতে অনুরোধ করে। কিন্তু সে কিছুই শুনে না; বরং উল্টো তাদেরকে টিটকারি করে বোকা বানিয়ে দেয়। জিদ করে অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে ঘোরাফেরা করে। বিদ্রুপ ও তিরস্কার করে তাদের লজ্জিত করে, তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়।

তার স্ত্রী সুমাইয়া তার এমন আচরণে অতিষ্ট হয়ে গেছে। তার অর্থহীন বাচাল কথাবার্তায় ও অসময়ের ঘোরাফেরা ঘৃণার চোখে দেখে। সে অন্তর থেকে এটা চায় যে, ইয়াছির যেন দীর্ঘ সময় নিদ্রাতেই কাটায়। সুমাইয়াকে

সাধ্যমত পরিশ্রম করে ঘরের কাজকর্ম সমাধা করতে হয়। তাই সে বিশ্রাম নেয়ার জন্য কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করে; কিন্তু ইয়াছির তাকে সে সুযোগ দেয় না। সে নিজেও বেশি ঘুমায় না, অন্যকেও ঘুমাতে দেয় না। সকলকে উত্ত্যক্ত করে তোলে। ঘরের সকলকে না জাগালে তার স্বস্তি হয় না। সে চায় ঘরের লোকেরা তার অফুরন্ত বাজে কথা শুনতে থাকুক। বেচারীরা কেবল শুনে যায়, কোন কথার উত্তর খুব কমই দিয়ে থাকে। তাছাড়া ইয়াছিরের কথা অসংবদ্ধ নয়; বরং নানা প্রকার প্রাসঙ্গিক অতি চিত্তাকর্ষক অভিনব ও মাধুর্যপূর্ণ। যে কথায় শ্রোতাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। তার কথায় তার ঘরের লোকেরা ব্যতীত অন্যরা বিরক্ত হয় না। সে তার পুরাতন পৈত্রিক বাসস্থান তেহামায়ে ইয়ামানের অপূর্ব কাহিনীসমূহ বর্ণনা করে। মাখযুম গোত্রের বণিক দলের সাথে তার শাম, ইরাক ও অন্যান্য দেশে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। কুরাইশ বংশের সৎ-অসৎ সকল প্রকার লোকের অবস্থা তার চেয়ে বেশি কেউ বলতে পারে না। তার এ অবিরাম কথাবার্তায় কাউকে রেয়াত করে না। সে এভাবে স্পষ্ট ভাষায় সকলের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে, যেন তার কথার প্রতি পরিবারকর্তার একটা বিশেষ আকর্ষণ জন্মে, গরীব লোকেরা যা চায় আর কি। তারা বড় লোকদের সম্পর্কে ভাল-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ সকল কথা শুনতে আনন্দ পায়। কুরাইশ বংশের কথা হলে ইয়াছিরের উৎসাহ বহুগুণে বেড়ে যায় এবং শ্রোতাদের মন জয় করে ফেলে।

সুমাইয়া জানত যে, ইয়াছির বেলা কিছু উঠার পরই ঘর থেকে বের হয়। কিন্তু একদিন সে ঘুম থেকে উঠে দেখল, ইয়াছির এখনো উঠেনি। তার একটি কথাও শুনা যাচ্ছে না। সে নির্বাক অবস্থায় স্বস্থানে পড়ে আছে। সে পূর্বের ন্যায় কোন কথাবার্তাও বলছে না। ঘোরাফেরাও করছে না। অন্য কেউ জাগানোর চেষ্টা-তদবীরও করছে না।

এ সুযোগে সুমাইয়া আরো কতক্ষণ ঘুমাল। এর পূর্বে বেচারীর প্রাতে ঘুমানোর সুযোগ হয়নি। তবু ইয়াছিরের মামুলি অবস্থার বিপরীত চুপচাপ দেখে তার ভাল লাগল না। যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে কখনো চুপচাপ বসে থাকেনি, তার হঠাৎ এমন নীরব বসে থাকা চিন্তার বিষয় বটে। এমন সাত পাঁচ ভেবে সুমাইয়া ইয়াছিরের নিকট গিয়ে দেখল, তার চেহারায় একটি সন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠেছে, কিন্তু অন্তরে যেন নারাজি ও ভয় মিশ্রিতভাব

প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সুমাইয়া ইয়াছিরের মেজায কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে বললো, কি অবস্থা? কোন প্রকার কষ্ট হচ্ছে কি?

ইয়াছির মৃদুস্বরে জবাব দিল– না, কিছু না। সব ঠিক আছে।

সুমাইয়া বললো, তবে আজ ঘরে তোমার শোরগোল না থাকায় দেখ, ঘর কেমন নিস্তব্ধ হয়ে আছে!

ইয়াছির বললো, আচ্ছা সুমাইয়া! তুমি তো দেখি অদ্ভুত মেয়ে লোক! তোমাকে খুশি রাখব কিভাবে?

এরপর তার কণ্ঠ পূর্বের ন্যায় ঠিক হতে লাগল। সে বললো, আমি যদি কোন কথা বলি, হাসি-ঠাট্টা করি, তুমি বলবে– আমার নিদ্রা ভঙ্গ করে দিলে। চুপ করে থাকলে বল, ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আজ আমি নিজে ইচ্ছা করে বা তোমাদের খাতিরে নীরবতা অবলম্বন করিনি। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, আমি গত রাতে এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। এ কারণে আমি আজ হাসি-তামাসার সব কথাই ভুলে গেছি।

এ কথা শুনে সুমাইয়ার মন শান্ত হল। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার কালো চেহারায় খুশির রেখা ফুটে উঠল। সে উপহাস করে বললো– খোদা তোমাকে যেন রোজ এমন ভয়ানক স্বপ্ন দেখান। আর তুমিও শোরগোল ভুলে যাও। আর আমি আরামের সাথে আমার ঘুম পুরা করতে পারব।

ইয়াছির উপহাস করে কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু তখনি তার কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল। চেহারা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বপ্নের ভয়-ভীতি তাকে উপহাস করতে বাধা দিল। চেহারা আবার মলিন হয়ে গেল। না সুমাইয়া! এটা যা তা কোন স্বপ্ন নয়। এটা এক অসাধারণ স্বপ্ন। অবশ্যই এর কোন তাবীর আছে। আমি অন্য সময়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছি, নিদ্রাভঙ্গের সাথে সব ভুলে গেছি। কিন্তু এ স্বপ্ন খুবই আশ্চর্য ধরনের। এর পূর্ণচিত্র আমার চোখের সামনে এখনো ভাসছে। স্বপ্নের কথাগুলো আমার মনের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছে। ঘটনাগুলো আমার মনে ও মস্তিষ্কে এমনই গভীর রেখাপাত করছে যে, আমি মুহূর্তের জন্যও এ খেয়াল ভুলতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আমি এখনো স্বপ্নের মধ্যেই আছি।

সুমাইয়া বললো, ভাল, তোমার স্বপ্নের কথা একবার শুনাও তো। তাহলে

তোমার মনের বোঝা আনেকটা হাল্কা হয়ে যাবে।

ইয়াছির একটি শীতল নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে উঠে বসল এবং থেমে থেমে তার ভয়ানক স্বপ্নের বিষয় বর্ণনা করতে লাগল। সে লজ্জাবতী ও সহনশীল না হলে ইয়ছিরের বাক রোধ করে দিত। তদুপরি সাহস সঞ্চয় করে বসে স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত শুনতে লাগল।

ইয়াছির বলতে লাগল– আমি তোমাকে স্বপ্নের কথা শুনাতে পারব না এবং পূর্ণ বিবরণ দেয়া আমার সাধ্যাতীত। তবে তোমাকে স্বপ্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তা যেন এখনো জাগ্রত অবস্থায় আমার চোখের সামনে ঘুরছে। আমি দেখলাম– এক উপত্যকা যা বেশি প্রশস্তও নয় এবং সংকীর্ণও নয়। তার দুই পাশে দুটি বড় পাহাড়। এত উঁচু যে তার চূড়া দেখা যায় না। পহাড় দুটি জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। তাতে অনেক গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ সকল গর্ত থেকে ভীষণ অগ্নিশিখা বের হচ্ছে। এক শিখা অন্য শিখার দিকে লাফ দিয়ে যাচ্ছে। বন্যার প্লাবনের মত সমগ্র উপত্যকা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। যেন অগ্নি উপত্যকা মনে হল। আমার সামনে এক সবুজ-শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত বাগান। যেখানে শীতল ও সুমিষ্ট পানির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। আগুন ঐ বাগান পর্যন্ত পৌঁছেনি; বরং তার কাছাকাছি গিয়ে নিভে যায়। আমি দেখলাম, তুমি ঐ সবুজ বাগানের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি যেন হারানো যৌবন ফিরে পেয়েছ। তোমার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়েছে। আমাকে দেখে তুমি হাসিমুখে চোখের ইশারায় সেদিকে ডাকছ। আওয়াজও দিচ্ছ। আমার পিছনে আম্মার দণ্ডায়মান। সে আমাকে ঐ আগুনে পুড়তে উৎসাহিত করছে। সে বলছে, আব্বাজান! সাহস করে ঢুকে যান, এই আগুন আপনার কোন ক্ষতি হবে না। এটা সামান্য ফুলকি মাত্র, এতে আপনার গায়ে দু'একটা ফোসকা পড়তে পারে মাত্র। পরক্ষণেই দেখবেন কেমন সুন্দর ফুলে-ফলে পূর্ণ বাগান। মাতা সুমাইয়া সেখানে গিয়ে নব যৌবন লাভ করেছেন। আপনার যৌবনও তার নিকট আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এদিকে আম্মার আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে, ওদিকে তুমি ডাকছ। তোমার আওয়াজ আমার কানে এসে পৌঁছেছে। অবশেষে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমি আগুনে প্রবেশ করামাত্রই তার স্পর্শ লেগে আমার চোখ খুলে গেল। এর পর বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়ে

চিৎকার করতে লাগল। আবার বলতে লাগল– হায় হায়! ঐ আগুনের উত্তাপ যেন আমি এখনো অনুভব করছি।

সুমাইয়া অস্থির হয়ে বললো, খোদা তোমাকে সকল বালা-মসিবত থেকে রক্ষা করুন! তুমি কোন চিন্তা করো না। আসো, এখন কিছু খানাপিনা কর। তারপর বাইরে গিয়ে কোন জ্যোতিষকে এই ভয়ংকর স্বপ্নের বিবরণ শুনাও। হয়ত সে এর একটা ব্যাখ্যা বলে দিতে পারবে।

ঐ দিন সন্ধ্যার আগেই তার ঐ স্বপ্ন সশরীরে যেন তার সম্মুখে প্রতিভাত হল। স্বপ্নের আগুনের জ্বলন যেন সে তখনো অনুভব করছে।

ছয়.

সুমাইয়াকে স্বপ্নের কথা শুনিয়ে ইয়াছির মক্কার মসজিদে গেলেন। সেখানে বনি মাখযুমদের মজলিস চলছে। সে সালাম করে মজলিসে বসে গেল। সে লক্ষ করল যে, তার আগমনে উপস্থিত লোকদের চেহারায় কোনরূপ সন্তুষ্টির ভাব নেই। পূর্বের ন্যায় কেউ তার সালামের জবাব দিল না। দু'একজন অবজ্ঞাভরে অস্ফুট জবাব দিলেও অন্যরা তাদের কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকল। যেন এ আগন্তুকের উপস্থিতি তারা কেউ টের পায়নি। তাদের এহেন অভদ্র ব্যবহারে ইয়াছির মনে মনে রাগান্বিত হল বটে; কিন্তু এ ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকল না। যেহেতু সে জানত যে মাখযুম গোত্রের লোকেরা বরাবরই অহংকারী। এই স্বভাবের কারণেই তারা আজ তার সাথে এমন অবাঞ্ছিত ব্যবহার করেছে। আবু হোযাইফার সাথে ওয়াদায় আবদ্ধ না থাকলে মাখযুম গোত্র ছেড়ে সে অন্য গোত্রের সাথে মিলিত হত। আবু হোযাইফার জীবদ্দশায় সে যেমন ওয়াদা পালন করেছিল, এখনো তেমনি পালন করে আসছে। আবু হোযাইফার নিকট সে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। তার নিঃস্ব অবস্থায় আবু হোযাইফা তার সহায় ও দুঃখের সময়ে হিতৈষী বন্ধু ছিল। বিশেষ করে সে সুমাইয়াকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছে। তাকে সে দুনিয়ার সবচেয়ে অধিক ভালবাসে। তার সন্তানদেরকেও জন্মের পূর্বেই সে আজাদ করে দিয়েছে এবং মৃত্যুর পূর্বে আবু হোযাইফা সুমাইয়াকেও

আজাদ করে দিয়ে গেছে। তার পর থেকে ইয়াছিরের পরিবার পূর্ণরূপে আজাদ হয়েছে। তাই আবু হোযাইফার ওয়াদা তাকে আমরণ পালন করতে হবে। ইয়াছির নিজ স্বপ্নের বিবরণ শুনানোর জন্যেই মাখযুম গোত্রের মজলিসে উপস্থিত হয়েছে। সে মনে করেছে, তারা এই বিভীষিকাময় স্বপ্নের বিবরণ শুনে আনন্দ উপভোগ করবে। আর হয়ত কেউ স্বপ্নের ব্যাখ্যাও করতে পারে। কিন্তু তাদের অস্বাভাবিক নীরবতা ও গর্বিত ভাব দেখে সে চুপ করে বসে থাকল।

বনি মাখযুমেরা ইতোপূর্বে সর্বদা তার সাথে সদ্ব্যবহার দেখিয়েছে। সেও নিসংকোচে হাসি-তামাশা করে তাদের মজলিসকে আমোদিত করত। এটা তার চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আজ তারা বড়ই গর্বিত অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করেছে। তার সাথে কোন কথাবার্তা বললো না, তাকেও কিছু বলার সুযোগ দিল না। এই গর্বিত লোকদের মজলিসে ইয়াছির চুপ করে বসে থাকাই শ্রেয় মনে করল। যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের পক্ষ থেকে তার সাথে কথা বলে।

বাকপটু ইয়াছিরের রসালো আলাপ মাখযুমেরা পছন্দ করত। নতুবা সে সেখানে টিকতে পারত না। কুরাইশ সম্প্রদায়ের জন্য তাকে গোত্রের মজলিসে যোগদান করতে হত। ধৈর্য ধরে ইয়াছির অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও তার অন্তরে প্রতিহিংসানল জ্বলছিল। তাকে বেশিক্ষণ সইতে হল না, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি কথা বললো। সে হল ওমর বিন হিশাম। আরবী প্রথানুযায়ী পুত্রের নাম সংযোগে তাকে আবুল হাকাম ডাকত। আর মুসলমানরা তার নাম দিয়েছে আবু জেহেল। সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কি হে ইয়াছির! আজ তোমার এত দেরি হল কেন?

ইয়াছির উপহাসের মতই বললো, আবুল হাকাম! অবশ্যই এর একটি কারণ আছে। ওমর বিন হিশাম অন্তরে বিদ্বেষ ও ক্রোধের ভাব লুকিয়ে রেখে বললো, আচ্ছা, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা না করলেই নয়!

ইয়াছির : কি কথা?

ওমর বিন হিশাম : তা হল, আমি কখনো তোমাকে আমোদের উপাস্য দেবতাদের নিকট যেতে দেখিনি বা ভাল নামে তাদের স্মরণ করতেও শুনিনি।

ইয়াছির : তবে কি মন্দ নামে তাদের স্মরণ করতে শুনেছ, না তাদেরকে কোন প্রকার তকলিফ দিতে দেখেছ?

ওমর : তারা আমাদের মাবুদ নয় কি? তোমার তো কোন ধরনের সম্পর্ক তাদের সাথে নেই।

ইয়াছির : বল তো তোমার আসল বক্তব্য কি? মতলবটাই বা কি?

ওমর ক্রোধে হিংসায় উত্তেজিত হয়ে বললো, হ্যাঁ আমরা আজ জানতে চাই, কে আমাদের সাথে আছে আর কে আমাদের বিরুদ্ধবাদী। এখন সময় এসেছে, প্রত্যেক মক্কাবাসীকে নিজের মনের কথা বলতে হবে। এখন পর্যন্ত আমাদের হলিফদের সাথে আমরা মধুর ব্যবহার করে আসছি, কিন্তু এখন থেকে আমরা তাদের কোন বিষয় বিন্দুমাত্র রেয়াত করব না।

ইয়াছির বললো, আবুল হাকাম! হিসাব করে কথা বল। আমি দাবী করে বলছি, যে সময় থেকে তোমার চাচা আবু হোযাইফার হলিফ হয়ে তোমাদের শত্রুদের শত্রু, মিত্রদের মিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি তখন থেকে তুমি বা তোমার গোষ্ঠীর লোকেরা কখনো আমার কোন দোষ-ত্রুটি দেখেছে কি? আজ আমি তোমাদের মুখ থেকে এমন কথা শুনছি, যা আমি মক্কায় হেরেমে এসে অদ্যাবধি শুনিনি।

ওমর : তাহলে তোমার প্রতিজ্ঞানুসারে তুমি আজ থেকে তোমার পুত্র আম্মারের দুশমন হলে? এই বলে সে বিদ্রুপের হাসি হাসল। হাসিতে উপহাস অপেক্ষা ক্রোধের উচ্ছ্বাসই বেশি ছিল।

ইয়াছির বললো, আবুল হাকাম! পরিষ্কার করে বল, আজ আমি তোমাদের কোন কথাই বুঝতে পারছি না।

ওমর বিন হিশাম : কী! তুমি জান না যে, তোমার ছেলে আম্মার ধর্মহীন হয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সহচরদেরকে মানতে শুরু করেছে! একথা শুনার সাথে সাথে ইয়াছির জ্ঞান হারাল। সে ঢলে পড়ল। তার বাকরোধ হল। শরীর বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তার কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম টপকে পড়তে লাগল।

তার এ অবস্থা দেখে মাখযুম সর্দারগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে একে অন্যের প্রতি তাকাতে লাগল। ওমর বিন হিশাম কিছু বলতে উদ্যত হলে তার চাচা

অলিদ বিন মুগীরা বলে উঠল, ভাতিজা! থাম, এই বুড়ার সাথে নরমী দেখাও। দেখ তো এ বেচারার কী দুর্দশা হয়েছে! এর ছেলের অপরাধের জন্য এর কোন দায়িত্ব নেই। সে এখন চল্লিশের উর্ধ্বে বুড়ো। মাখযুমের অন্য এক সর্দারও অলিদের কথার পুনরুক্তি করল। ইত্যবসরে ধীরে ধীরে ইয়াছিরের চৈতন্য ফিরে এল। উপস্থিত সকলকে নিশ্চুপ দেখে সে ওমর বিন হিশামকে লক্ষ করে বললো, আবুল হাকাম! বড়ই লজ্জার কথা! তুমি নিজ হলিফের সাথে দুর্ব্যবহার করছ! আমি আম্মারকে কালও দেখিনি, আজও দেখিনি। তার কি হাল-অবস্থা তা আমি এখন পর্যন্ত কিছুই জানি না। এখন পর্যন্ত তার সাথে আমার দেখা হয়নি। তুমি আমার সাথে অনুচিত কঠোর ব্যবহার করছ। কাউকে ধিক্কার দেওয়ার আগে তার কসুর আছে কি না তা না দেখে রসনা চালাতে শুরু করেছ। যা হোক, তোমরা তোমাদের বনি মাখযুম গোত্রের অন্যতম সর্দার আরকাম বিন আরকামের সাথে কেন কঠোরতা অবলম্বন করছ না? তোমার কথানুসারে আম্মার যদি বেদীন হয়ে থাকে, তবে তার আগে আরকাম বিন আরকামও বেদীন হয়েছে। সে তো তার নিজ গৃহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছে। সেখানে তার সহচরগণ এসে তার সাথে মুলাকাত করে। সেখান থেকে তার কাজ চালাচ্ছে। তোমাদের মাবুদগণের নিন্দা করছে। প্রকৃত কথা এই যে, তোমরা আরকাম বিন আরকামকে ভয় কর। তোমরা তার প্রতি আঙ্গুল উঠালে তার আত্মীয়-স্বজনরা তার জবাব দিবে। আমার হলিফ তোমার চাচা আবু হোযাইফা এখন জীবিত নেই। তিনি বর্তমানে জীবিত থাকলে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করতে তোমাদের চিন্তা করতে হত। এই বলে ইয়াছির উদাস মনে ঢুলতে ঢুলতে নিজ বাড়ির দিকে যাত্রা করল। তার অনুপস্থিতিতে বনি মাখযুমগণ একে অন্যকে তিরস্কার করতে লাগল।

সাত.

ইয়াছির ঘরে ফিরে দেখল তার ঘরের সব কিছুতেই যেন একটি পরিবর্তন ঘটেছে। ঘরের লোকদের অবস্থাও যেন বদলে গেছে। সম্পূর্ণ পরিবেশের পরিবর্তন অনুভূত হচ্ছে। তার বিবি সুমাইয়া খুশিতে ভরপুর। তার কালো চেহারাতেও আনন্দের ছটা ফুটে উঠেছে। হাসি-খুশিতে সে যেন ফুলে উঠেছে। ইয়াছিরকে দেখামাত্রই সে তার সামনে এসে মধুরস্বরে বললো, ইয়াছির, মোবারকবাদ! আম্মার আজ আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এনেছে।

ইয়াছির চমৎকৃত হয়ে বললো, আখিরাত! আখিরাত আবার কি? তুমি কী বলছ? আমি তো এখন বড় সংকটে পড়েছি। রাতের স্বপ্ন আমাকে পেরেশান করে রেখেছে। দিনের বেলায় মানুষের কথাবার্তা যেন আমার বুঝে আসে না। বড়ই মুসিবতের কথা! এদিকে আম্মারও বলতে লাগল, আব্বাজান! আমাদের মঙ্গল হোক, আমি আপনার জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এনেছি।

ইয়াছির বললো, তোমার মতলব কি? লোকেরা বলছে, তুমি বেদীন হয়ে গেছ। হতভাগা! তুমি আপন মা-বাবার জন্যে কি বিপদই না টেনে আনলে।

আম্মার হেসে বলতে লাগল– আগে আমি কি নিয়ামত হাসিল করেছি তা বুঝতে চেষ্টা করুন। কেননা আমি তো আপনাদের উভয়ের জন্য দুনিয়া ও

আখিরাতের কল্যাণ বয়ে এনেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি বেদীন হইনি; বরং সেই খোদা, যিনি জমিন ও আসমান, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র পয়দা করেছেন, তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন– আমাদেরকে সরল সত্য পথ দেখানোর জন্যে বিশুদ্ধ জীবন-যাপনের পন্থা দেখাতে, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে আনতে, মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার গর্ত থেকে বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, হেদায়াতের, উঁচু স্তরে পৌঁছে দিতে। আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ঈমানওয়ালা ও বিশুদ্ধ জীবন-যাপনকারীদেরকে এই শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং মরণের পরও সন্তুষ্ট হয়ে তাদের সৎকাজের উপযুক্ত প্রতিফলস্বরূপ বেহেশত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানে না, সত্যকে মিথ্যা বুঝে, তার উপর দুনিয়াতেও আল্লাহর লানত এবং মরণের পরও সে জাহান্নামে গিয়ে অনন্তকাল পড়ে থাকবে বলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয় প্রদর্শন করছেন।

বৃদ্ধ ইয়াছির খুব মনযোগের সাথে শুনছিল বলে মনে হচ্ছিল। কথাগুলি কেবল তার কানেই ঢুকছে না; বরং সোজা অন্তরে প্রবিষ্ট হচ্ছে। তার চেহারা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে লাগল বটে, তবে তার শক্তি যেন হ্রাস পেতে লাগল। তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। অবশেষে সে শক্তিহীন হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তার বিবি ও ছেলে এসে তাকে ধরে বসিয়ে দিল। তারা খুব যত্নের সাথে তার সেবা শুশ্রূষা করতে লাগল। বৃদ্ধ চুপচাপ বসে থাকল। মাঝে মাঝে তার মুখ দিয়ে বের হতে লাগল– হ্যাঁ ইয়া, ওটা তাই বটে।

আম্মার কোমল সুরে জিজ্ঞাসা করল, আব্বাজান! আপনি কী বলছেন?

ইয়াছির কথা বলার চেষ্টা করল কিন্তু তার কণ্ঠ শুকিয়ে গেল। আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে গেল। অতি কষ্টে কিছু আওয়াজ বের হল। তার চক্ষু দিয়ে টপ টপ অশ্রু নির্গত হতে লাগল। সে বলতে লাগল, হ্যাঁ ঠিক এটা ঐ বিষয় বৎস! তুমি আজ আমাকে অতি পুরাতন কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। আমি যখন প্রথম মক্কাতে আসি, তখন আমার বয়স ২৫ বছরের বেশি নয়। আবু হোযাইফা আমাকে তার উপাস্য দেবতার নিকট নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করতে চাইল। আমি তা অস্বীকার করে বলেছিলাম, যদি আমি কাউকে উপাস্য বানাতাম তবে সমুদ্রকে বানাতাম। যার অনন্ত বিস্তার দেখে আমি অভিভূত হয়ে থাকি অথবা সূর্যকে বানাতাম, যে আমাদেরকে আলো দান করে কিংবা তারকারাজিকে– যারা অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করে। এদের কোনটাই তার

উপাসনার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট করতে পারেনি। বৎস! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে জানিয়েছেন, এই সকল জিনিসেরই একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন ও পরিচালনা করছেন। তিনিই ঐ সত্তা– এই বলে তার চক্ষু থেকে রীতিমত অশ্রুধারা বইতে লাগল। সে কাঁদতে কাঁদতে আবার বলে উঠল, নিঃসন্দেহে এই হচ্ছে ঐ সত্তা, যার উদ্দেশে আমি নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে অবস্থান করছি। আমার পিতৃকুল আনছ বংশের কোন আত্মীয়-স্বজনের নিকট না থেকে মাখযুম গোত্রের হলিফ হয়ে থাকাকে পছন্দ করেছি। আমার দুই ভাইকে ইয়ামানের পথে বিদায় দিয়ে মক্কাতেই বসবাস করছি। তারপর সে সুমাইয়ার দিকে চেয়ে বললো, সুমাইয়া! তোমার মুহাব্বতই আমাকে এ শুভদিনের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ করে রেখেছে। এই বলে সে পুনরায় মাথা নিচু করল। অনেকক্ষণ পর মাথা যখন তুলল, তখন অশ্রুধারা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু তার পক্ব দাড়িতে অশ্রুবিন্দু মুক্তার কণার মত ঝলমল করছিল।

তার পর পুত্র আম্মারকে বললো, বাবা! আমাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কখন নিয়ে যাবে? আমি তার কথা শুনতে চাই।

আম্মার বললো, এখনি চলুন!

পুত্রকে নিয়ে ইয়াছির হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে তার অমৃতবাণী শ্রবণ করে মুসলমান হয়ে ঘরে ফিরলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় ওমর বিন হিশাম মাখযুম গোত্রের কিছু সংখ্যক আজাদ ও গোলাম যুবক সাথে নিয়ে ইয়াছিরের ঘরে গেল। তারা আম্মার ও তার পিতা-মাতার হাতে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। যুবকদল শিকলাবদ্ধ ইয়াছির পরিবারকে অন্য এক ঘরে আবদ্ধ রাখার জন্য হেঁচড়িয়ে টানতে লাগল।

বৃদ্ধ ইয়াছির তার স্ত্রীকে বললো, দেখ সুমাইয়া! আজ প্রথম দিবসেই আমার ঐ স্বপ্ন স্বশরীরে আমার সম্মুখে প্রতিভাত হচ্ছে।

এদিকে পুত্র আম্মার বলে উঠল, আব্বা, নিশ্চিত থাকুন, এর পরেই বেহেশত আছে। যেখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাসী ও তার আহ্বানে সাড়াদাতাগণের জন্য সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি বিরাজমান এবং সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির অফুরন্ত নিয়ামত বিদ্যমান।

আট.

পরদিন কিছু বেলা হলে কুরাইশরা মসজিদে হারামে মিলিত হল। কিন্তু আজ কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা বেচাকেনার কোন বিষয় তাদের আলোচনার বিষয় নয়; তাদের আলোচ্য বিষয় হল, এই শান্তি নিকেতন মক্কা নগরে নিরপরাধ লোকের ঘর-দুয়ার জ্বালিয়ে দেয়ার দৃষ্টান্ত কখনো দেখা যায়নি; নির্দোষ স্ত্রী-পুরুষকে লৌহ-শৃংখলে আবদ্ধ করার কথা কখনো শুনা যায়নি। যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করেনি বা কাউকেও হত্যা করেনি তাকে অযথা অমানুষিক শাস্তি প্রদানের কথা কখনো শোনা যায়নি। আজ সে মক্কাতেই বনি মাখযুমের এক উদ্ধত অবাধ্য ও অন্যায় আচরণকারী যুবক এক গুরুতর ঘটনা ঘটিয়েছে।

মুগিরার পুত্র অলিদ ওমর বিন হিশামকে (আবু জাহেল) বললো, ভাতিজা! বড়ই আফসোসের কথা, তুমি পবিত্র হেরেমে এমন এক কাজ করেছ যা কুরাইশ বংশের চিরাচরিত প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত। তুমি এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে বা অপর কোন মুরব্বীর সাথে কোন প্রকার পরামর্শ না করে তোমার ইচ্ছামত কিছুসংখ্যক আহমক ও বেঅকুফ যুবক ও গোলাম নিয়ে নিরপরাধ ইয়াছির পরিবারের ঘর-দুয়ার জ্বালিয়ে ও তাদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে কি এক কুকাণ্ডই না করেছ! খোদার কসম! আমার আশংকা হচ্ছে,

তোমার এই অত্যাচারের বিষময় ফল নিশ্চয়ই একদিন ফলবে। কারণ সমস্ত আরববাসীর অন্তরে এই হেরেম শরীফের ইজ্জত-সম্মান অতি গাঢ়ভাবে নিবদ্ধ।

লোকেরা ভয়ভীতির সময় এখানে আশ্রয় নিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। ক্ষুধার্ত এখানে এলে খাবার পায়, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। দুঃখী দরিদ্ররা এখানে এসে আশ্রয় নেয় এবং শান্তিপূর্ণ সচ্ছল জীবন-যাপন করে। এই পবিত্র হেরেম মজলুমদের আশ্রয়স্থল। নিঃস্ব ও নিঃসম্বলদের ভরসাস্থল। নিপীড়িত লোকেরা এখানে এসে সান্ত্বনা লাভ করে। নির্যাতিত ফরিয়াদকারীরা এখানে প্রতিকার লাভ করে। একবার ভেবে দেখ, এই সংবাদ বায়ুবেগে সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়বে। তখন আরববাসীরা কী বলবে? তারা ভাববে, এখন আর মক্কার হেরেমে পানাহ মিলবে না। এই পবিত্র ঘরের নিরাপদ ছায়ায় আর নিরাপত্তা নেই। এখানকার সকল প্রকার সুখ-সুবিধা খতম হয়ে গেছে। এখানে মানুষের বসতবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তাদের হস্তপদ শৃংখলাবদ্ধ করে নানা প্রকার শাস্তি দেয়া হয়। আরব মুলকের জনসাধারণের এ ধারণা হবে যে, কুরাইশ সম্প্রদায়ের নির্বোধ যুবকেরা অবাধ্য ও নাফরমান হয়ে গেছে। এখন তারা কারো কথা শুনে না। তাদের সর্দারগণকেও গ্রাহ্য করে না। তাদের স্বগোত্রীয় জ্ঞানী মুরুব্বীদের কথাও শুনে না। তাদের মাথায় যা খেলে তাই নির্বিচারে করে বসে। প্রতিবেশীদের হক ও ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি তাদের কোন লক্ষ নেই। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলিফদের প্রতি ওয়াদার কোন হেফাযত নেই। আমি মাখযুমিদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছি, তারা যেন সত্বর কয়েদিদের মুক্ত করে দেয়। আর আবুল হাকাম! তুমি ও তোমার লোকেরা এদের বিচার কর।

আবুল হাকামের (এরপর থেকে তাকে আমরা আবু জাহেল বলব) চেহারা রাগে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত লাল হয়ে উঠল। সে বলে উঠল, লাত ও ওজ্জার কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে জীবন আছে, আর হাতে এই তরবারী আছে, তোমরা এই কায়েদীদের গায়ে হাত লাগাতে পারবে না। আমি খুব ভাল করেই জানি যে, আমি এ শহরের চিরাচরিত রীতি-নীতির বিপরীত কাজ করেছি। কিন্তু তোমাদের এটাও জানা উচিত যে, সর্বপ্রথম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শহরের দস্তুর ভঙ্গ করেছে।

অলিদ নরম ভাষায় বললো, ভাতিজা কী বলছ? মুহাম্মদ তো কারো ঘরে আগুন দেয়নি। কাউকে শিকলে বেঁধে টানেনি, হাতে পয়ে বেড়িও লাগায়নি।

আবু জাহেল বললো, সে এর চেয়েও অধিক জঘন্য কাজ করেছে। সে গোলামদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে উস্কাচ্ছে। সাধারণ লোকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে। আমাদের দেবতাগণের সম্পর্কে কুধারণার জন্ম দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, অধিকন্তু যে অধিকার মর্যাদা ও ধন-সম্পদ পুরুষানুক্রমে ভোগ করে আসছি, তাতে সকলের সমান অধিকারের লালসা লোকদেরকে দেখাচ্ছে। আমরা এতদিন এদিকে বিশেষ নজর দেইনি, কিন্তু এখন থেকে আমরা আমাদের সর্বপ্রকার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করব ও সর্বশক্তি ব্যয় করব। তোমরা কি মুহাম্মদের অনুসরণকারীদের দেখনি, তারা কেমন কথাবার্তা বলছে? দুর্বৃত্তরা বলেছে, আমরাও তোমাদের মত মানুষ। তোমাদের যেমন হক আছে, আমাদেরও তেমন আছে। তোমাদের যেমন দায়িত্ব আমাদেরও তেমন দায়িত্ব আছে। খোদার নিকট তোমাদের চেয়ে আমাদের মর্তবা অধিক, যেহেতু আমরা খালেস নিয়তে তার উপাসনা করে থাকি। শুধু তারই উপর আমরা ঈমান এনেছি। লাত, মানাত, ওজ্জা, হোবল ইত্যাদি মূর্তি বা অন্য কোন কিছুকে আমরা তার সাথে শরীক করি না। তারা যেন অতি জ্ঞানী ও হুশিয়ার বনেছে। আর আমরা বড় আহমক। যদি তোমরা মুহাম্মদ ও তার সহচরদেরকে মক্কার জমিনে এমন স্বাধীনতার সাথে এই বিপথগামী ধারণা সর্বসাধারণের কাছে প্রচার করতে দাও, তবে একদিন না একদিন উঁচুস্তরের সম্মানিত লোকদের নিম্নস্তরে নেমে আসতে হবে। আর নিম্নস্তরের লোকেরা আমাদের সাথে সমঅধিকার লাভ করবে। আমাদেরকে পুরুষানুক্রমে অর্জিত মর্তবা ও মর্যাদা থেকে হাত ধুয়ে বসতে হবে এবং আমাদের এ সমস্ত ধন-দৌলত ও প্রতিপত্তি চিরতরে খতম হয়ে যাবে। এখন বল তো, কোন কাজটা অধিকতর মন্দ, ক্ষতিকর?

আরবের বাসিন্দারা এই ঘটনা শুনে এটাই বলবে যে, মক্কার জ্ঞানী লোকেরা বেঅকুফদেরকে সরল পথে আনার জন্য তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করে। তাদেরকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করছে। না কি তারা এ কথা বলবে যে, মক্কার গোলামেরা সেখানকার সর্দার ও নেতা বনেছে, আর সর্দারেরা

তাদের গোলাম হয়েছে। যে দেবতার দর্শন লাভের জন্য তারা দূরাঞ্চল থেকে ভ্রমণ করে আসে, তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়, খোদার কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ আছে আর হাতে এই তরবারী, ততক্ষণ তোমরা এই কয়েদীদেরকে ছাড়ানোর মানসে তাদের গায়ে হাত লাগাতে পারবে না।

উমাইয়া বিন খালফ বললো, সাবাশ! খোদা তোমার মঙ্গল করুক। তুমি কাল যা করেছ ঠিকই করেছ। আর আজ যা বললে সত্যই বলেছ। খোদার কসম! মুহাম্মদ ও তার সহচরেরা এ কবিলার একটি কণ্টক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুরুতেই যদি এ কণ্টক উৎপাটন না করা হয়, তবে এ কবিলার উপর এ উৎপাত থেকেই যাবে। তোমার চাচার সাথে যদি তার গোলাম ও হলিফদের এমন ঘটনা ঘটত, যেমন আমার নিজের গোলাম ও চাকরের সাথে ঘটেছে, তবে তিনি এমন কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করতেন না। আর আজ থেকে এমন তিরস্কার ও দোষারোপ করা ত্যাগ করতেন। তুমি যে ব্যবহার কাল মাখযুমীদের কয়েদী ও গোলামদের সাথে করেছ, ঠিক তেমন ব্যবহার আমিও জুমা গোত্রের কিছু গোলাম ও হলিফের সাথে করেছি এবং খুব ভালভাবে তাদেরকে শাস্তির স্বাদ উপভোগ করিয়েছি।

হে কুরাইশগণ! তোমাদের অবস্থার বিপর্যয় ঘটেছে। এই বিপ্লব তোমাদের ঘরে এসে পড়েছে। এর সর্বগ্রাসী অনলশিখা তোমাদের ঘরে প্রবেশ করেছে। তোমাদেরকে এ আগুন এখনি নিভাতে হবে। তোমরা যদি চাও, এই দেবতাদের দুনিয়াজুড়া খ্যাতি মিটে যাক। আরববাসী হজ্বব্রত সমাপন করতেও এখানে এসে আশ্রয় নিতে বাধাপ্রাপ্ত হোক, আর তোমাদের গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ইতিহাস শুধুমাত্র জনশ্রুতিতেই পর্যবসিত হোক, তাহলে তোমরা মুহাম্মদ ও তার সহচরদেরকে তাদের ইচ্ছেমত কাজ চালাতে দাও। আর যদি তোমরা প্রকৃত প্রস্তাবে আপন ধনরত্ন ও মান-মর্যাদা হিফাজত করতে চাও, আপন দেবতাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি কায়েম রাখার বাসনা রাখ, লোকজনের অন্তরে হেরেম শরীফের মর্যাদা বিদ্যমান রাখতে দৃঢ়সংকল্প হও, তবে শক্তি অর্জন কর। কোমর বেঁধে লাগ। জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর। বর্তমান অদ্ভুত পরিস্থিতির পরিসমাপ্তির জন্য সচেষ্ট হও। এই কাজে দেহ মন ও সম্পদ ব্যয়ে সকলে প্রতিযোগিতা করতে থাক। এই মূর্খদেরকে আর বেশি ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির সুযোগ দিও

না।

তারপর আবু সুফিয়ান বিন হারব দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, দেখ, আমিও নিশ্চিন্ত নই। আমার ভয় হচ্ছে, যদি আমি আগামী দিন বাণিজ্যের পণ্যসামগ্রী নিয়ে শাম বা ইয়ামান দেশে যাই এবং কয়েক মাস পরে প্রত্যাবর্তন করি, তখন হয়তো দেখতে পাব, এখানকার ধনাঢ্য ও অবস্থাশালী অধিবাসীগণ তাদের বাড়ি-ঘর ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কুরাইশগণ মনোযোগ দিয়ে শোন! সতর্ক হয়ে যাও! তেজারত বাস্তবিকই অতি উত্তম ও লাভের জিনিস, কিন্তু তার পৃষ্ঠপোষক কেউ না থাকলে তাতে কোন লাভ নেই। তেজারতের বলেই আমরা দুনিয়াতে ধন-সম্পদ ও মর্যাদাশালী সম্প্রদায় বলে খ্যাতি লাভ করেছি।

তোমরা বেদুঈন আরবদেরকে খোসামোদ করে থাক। তাদের মন যোগাও, কিছু কিছু দিয়ে হলেও তাদেরকে রাজি রাখ, যাতে তারা তোমাদের বণিক কাফেলা লুট না করে এবং শাম ও ইয়ামানের রাস্তা নিরাপদ থাকে। কিন্তু হতভাগা! তোমরা আপন ঘরের তেজারত হেফাজত করতে না পারলে বাইরে আর কি করবে। খোদার কসম! আমি এখান থেকে নড়ব না। এক শস্যকণা নিয়েও তেজারতে বের হব না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে এই দৃঢ় আশ্বাস না দাও যে, তোমরা আমার পিছনে থেকে আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবে। আর যে অবস্থায় আমি মক্কাবাসীকে রেখে যাব তেজারত থেকে ফিরে এসেও ঠিক সে অবস্থায় সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে পাব। তাদের ধন-দৌলতের কোন ঘাটতি হবে না। লোক সংখ্যায়ও কোন ব্যক্তিক্রম হবে না।

অলিদ বিন মুগীরা হেসে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, আমার ভাতিজার সাথে কথা বলে আমি তোমাদের মনের লুকায়িত চোরকে ধরে ফেলেছি। আমি বুঝতে পারছি না, তোমরা কেন এমন শংকিত ও আতঙ্কগ্রস্ত? তোমাদের মন-রসনা যেন তোমাদের আয়ত্বে নেই, নিজে নিজেই পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকছ। মুহাম্মদের অতি ছোট একটি দল, তাদেরকে তোমরা কেন এত ভয় কর? আমার মনে হয়, তোমরা এদেরকে তেপান্তরের কাল্পনিক ভূতের মত ভয় কর। তারা তো সাদাসিধে গরীব লোক। আপসেই কথাবার্তা বলে। তোমাদের কোন লোককেও তারা ভাগিয়ে নিয়ে

যায়নি। তোমাদের কোন মালামালও নিয়ে যায়নি।

আবু সুফিয়ান বললো, আচ্ছা, তুমি কি চাও যে, আমরা তাদের এসব যা-তা করার সুযোগ দেই?

আবু জাহেল বললো, আমি অংকুরেই এ বৃক্ষটির মূল উৎপাটন করতে চাই। এই আপদ-বালা আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে। আবু সুফিয়ান! তুমি আমাদের তেজারতি মাল নিয়ে যেখানে খুশি চলে যাও। আমরা তোমার পেছনে আছি। আমরা সার্বিকভাবে তোমার সহযোগিতা করব। মক্কার নেগরানী তোমার আশানুরূপ আমরা করব।

উৎবা বিন রাবিআহ বললো, কুরাইশী যুবকগণ! তোমরা ঠিক কাজই করেছ, আর সব কিছুই ঠিক বলেছ। খোদার কসম! আমরা এটা কখনো বরদাস্ত করতে পারব না যে, আমাদের জ্ঞানী ও সমঝদার লোকেরা আহমক হয়ে যাবে। আমাদের উপাস্য দেবতাগণকে নিন্দা করবে অথবা আমাদের ধন-সম্পদ ফেতনা-ফাসাদের বিষয়বস্তু হবে। কিন্তু কঠোরতা পরিত্যাগ করে মধ্যপস্থা অবলম্বন করা উচিত। নিজ কওমের নির্বোধ লোকদের সরল ও মিষ্টি ভাষায় বুঝাতে হবে। আর গোলাম ও হলিফদের সাথে খুব কঠোর ব্যবহার করতে হবে। এভাবে আমরা আপসে শান্তি-শৃংখলা বজায় রেখে গোলাম ও হলিফদেরকে শাস্তি দিয়ে অন্যকে শিক্ষা দেয়ার উপায় করতে পারব।

আবু জাহেল বললো, আমি তো তাই করেছি এবং শক্তভাবেই করেছি। আমার মনমত যদি কাজ করতাম, তবে বেঅকুফ আরকাম বিন আরকামকে হত্যা না করে ছাড়তাম না। তার ঘরের সব লোককে আগুনে জ্বালিয়ে আমার মনের আগুন নিভাতাম। কিন্তু মাখযুম কবিলার জন্য সব সময় শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করি। এ কারণে আমি মাখযুম গোত্রের গোলাম ও দুর্বল হলিফদেরকে শাস্তি দিয়ে কুরাইশ গোত্রের অন্য লোকদের উপদেশ দানের ব্যবস্থা করেছি। এটা দেখে যেন তারা শিক্ষা লাভ করতে পারে। আমাদের যেন কষ্ট করে তাদেরকে আর শাস্তি দিতে না হয়।

অলিদ বিন মুগীরা হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘৃণা ও বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন, ভাতিজা! খোদার কসম! তোমরা যা করছ সম্পূর্ণ মন্দ কাজই করছ। শক্তিমানেরা আপন সমকক্ষ লোকের সাথে শক্তি-পরীক্ষা

করে। হলিফ ও গোলামদের সাথে শক্তি-পরীক্ষা করতে গেলে নিজের দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়, কিন্তু যার কথা কেউ মানে না, তার পক্ষে পরামর্শ দেয়া না দেয়া সমান।

তারপর কুরাইশ বংশের সব লোক উঠে চলে গেল। অধিকাংশ সর্দারই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন, কিন্তু আবু জাহেল তার দলের কিছু গোলাম যুবক সাথে নিয়ে তার বন্দিগণের নিকট গেল। যে ঘরে রাতে বন্দিরা শৃংখলাবদ্ধ ছিল সে ঘর থেকে তাদেরকে বের করে হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। তাদেরকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে হাঁকাতে হাঁকাতে বলতে লাগল, তাড়াতাড়ি চল। তার সাথীরা এই নিরপরাধ শৃংখলাবদ্ধ বন্দীদেরকে পেছন থেকে সঙ্গীনের আঘাতে তাদের দেহ রক্তাক্ত করে ফেলল। কিন্তু এ বর্বরতা ও জুলুম বন্দিদের পাহাড়সম মজবুত ঈমান টলাতে পারল না। আবু জাহেল কখনো ইয়াছির ও আম্মারের দাড়ি ধরে, কখনো সুমাইয়ার মাথার চুল টেনে খুব হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল। বাঁশি বাজিয়ে দর্শকদের ভিড় জমাল।

যে পথ ধরে তারা চলছিল তার আশপাশের লোকেরা শোরগোল শুনে ঘরের বাইরে এসে তামাশা দেখতে লাগল। চতুর্দিক থেকে পথিকেরা এসে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করতে লাগল। বন্দিরা যদিও নির্বাক কিন্তু তাদের ঈমানের আলোতে আলোকিত চেহারা দেখলে মনে হয় যে, তারা কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রেমে বিভোর ও আত্মভোলা। তারা উহ্ আহ্ শব্দ করে কোন ধরনের কষ্টানুভূতি প্রকাশ না করতেও দৃঢ়সংকল্প।

অবশেষে তাদেরকে মক্কার বাইরে এক বালুকাময় মাঠে টেনে নিয়ে গেল। আবু জাহেল অগ্রবর্তী হয়ে ইয়াছিরকে বিদ্রুপের সাথে বলতে লাগল, কি ইয়াছির! এখনো মাখযুমদের সাথে তোমার কৃত হলফে কায়েম আছ? গতকাল পর্যন্ত ঠিক আছ, বলে খুব স্বীকার করেছ!

ইয়াছির উত্তর করল, তুমি আমাদের উপর অত্যাচার ও জুলুম করে হলফ ভঙ্গ করেছ। এর দায়ভার তোমার উপর, আমার উপর নয়।

আবু জাহেল বললো, তবে কি তুমি আমাদের হলফ থেকে মুক্ত হয়েছ?

ইয়াছির : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হয়েছি। যেমন আমি সমস্ত অন্যায় ও লজ্জাকর

কার্যকলাপ থেকে মুক্ত ও বিরক্ত।

আবু জাহেল এ উত্তর শুনেই ইয়াছিরের মুখে এক কঠিন আঘাত করে তার চেহারা রক্তাক্ত করে দিল। আবু জাহেলের দেখাদেখি তার সাথীরাও সুমাইয়া ও আম্মারের মুখে সঙ্গীনের খোচা দিয়ে রক্ত বইয়ে দিল।

আবু জাহেল তার সঙ্গীদের আবার বললো, বন্দিদেরকে ময়দানে শোয়ায়ে তাদের বুকে ও পিঠে তপ্ত লৌহশলা দ্বারা দাগিয়ে দাও।

তৎক্ষণাৎ তার আদেশ বাস্তবায়ন করা হল। তারপর তাদের বুকের উপর ভারি পাথর চাপা দিয়ে মুখের উপর মশক ভরা পানি ঢালতে লাগল। আবু জাহেল ভেবেছিল বন্দিরা উৎপীড়িত হয়ে উহ্ আহ্ করে কান্নাকাটি করবে। কিন্তু বন্দিদের জবান বন্ধ। তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিভোর। তারা তাদের দেহ জালিমদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছিল। আবু জাহেল ও তার সঙ্গীরা এ নিরপরাধ ও দুর্বল অসহায় বন্দিদের দেহের উপর অনেকক্ষণ ইচ্ছামত অত্যাচার নির্যাতন চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে গেল। তারপর তাদেরকে উত্তপ্ত বালির উপর শায়িত রেখে কয়েকজন পাহারাদার নিযুক্ত করে ঘরে ফিরে গেল, যাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকালে এসে নবউদ্যমে শাস্তি দিতে পারে।

নয়.

হরব বিন উমাইয়া আবদুল্লাহ বিন জুদানকে বললো, আবদুল্লাহ্! তোমার রুমী গোলামের মত হুঁশিয়ার ও বুদ্ধিমান লোক আমি আর দেখিনি। তেজারতের কাজে সে খুব উস্তাদ।

আবদুল্লাহ বললো, হ্যাঁ, ঠিক বটে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, সে কি আসলে আরব বংশীয় লোক, না রুম দেশীয় লোক। তার কথামতে সে আরব বংশীয়। রুম-পারস্যের যুদ্ধে রোমানরা তাকে বন্দি করে নিয়ে আরবের কলবী বংশীয় বণিকদের নিকট বিক্রি করেছিল। কলবীরা বলছে, সে প্রকৃতপক্ষে রোমক বংশীয় লোক। যখন আরব ও পার্সিয়ানরা মিলে রুম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল তখন সে কলবীদের হাতে বন্দি হয়। আমি তাকে শামদেশে কলবীদের নিকট থেকে খরিদ করেছি।

হরব বললো, এর গায়ের চামড়ায় এক প্রকার লাল আভা দেখা যায়, যা সাধারণত আরবদের মধ্যে দেখা যায় না। তাছাড়া তার ভাষায় রোমান ভাষার উচ্চারণভঙ্গি পাওয়া যায়। অধিকাংশ শামদেশীয় লোকের ভাষার ভঙ্গি প্রায় তার মত। সে রুমী হোক বা আরব হোক, তার মত বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যবসায়ী আমি আর দেখিনি। ইয়ামান দেশে ও সাগরের ওপারে আবেসিনিয়াতে বাণিজ্য ভ্রমণে তাকে জিন বলে মনে হত। শত মাইল দূর

থেকে সে বাণিজ্যকেন্দ্রের গন্ধ পেত এবং সহস্র ক্রোশ দূর থেকে সে ব্যবসায়ীদের খোঁজ নিতে পারত। সে বলত, অমুক বস্তিতে গেলে খুব বেচাকেনা হবে। ফলে তাই হত। আবেসিনিয়ার বাণিজ্যে অধিক লাভের আভাস যে কিভাবে পেত তা বুঝতাম না। সেখানে গিয়ে সে অন্য ব্যবসায়ীদের সাথে মিলে যেত। তারা আমাদের কথা কিছুই বুঝে না, রুমীর কথা সামান্য সামান্য বুঝে। সে তাদের সাথে মিশে আমাদের সমস্ত পণ্য বিক্রি করে দিল। আর তাদের নিকট থেকে এমন সব জিনিস ক্রয় করে নিল যা আমরা নিতে চাইনি। কারণ ঐসব জিনিস উঠিয়ে আনার শক্তিও আমাদের ছিল না। কিন্তু সে তা ক্রয় করে উটের পরিবর্তে সমুদ্রগামী নৌকাযোগে এদেশে নিয়ে এল। আরো মজার বিষয় এই যে, ঐ সকল নৌকায় সে দেশীয় কয়েকজন ব্যবসায়ীকে সাথে এনে সে দেশের চাহিদা মত এদেশীয় অনেক জিনিস তাদের নিকট বিক্রি করে নৌকা বোঝাই করে দিল। তার এক সফরে দুই বাণিজ্যের কাজ সমাধা হল।

আবদুল্লাহ বিন জুদান বললো, এটা আমি ভাল করেই জানি যে, এই গোলামটি অতি হুঁশিয়ার ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং চরিত্রবান লোক। আমি তো প্রথমে একে খরিদ করতেই চাইনি। কিন্তু কেনার পর তার দ্বারা আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। সেদিন সন্ধ্যায় আবদুল্লাহ বিন জুদান তার এই গোলামকে নির্জনে ডেকে জিজ্ঞেস করল, সোহাইব! তুমি ইয়ামান ও আবেসিনিয়ার বাণিজ্যে বড়ই বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছ। হরব বিন উমাইয়া তোমার ভূয়সী প্রশংসা না করলেও তুমি যে প্রচুর মালপত্র এনেছ তাই তোমার গুণের জ্বলন্ত প্রমাণ। আচ্ছা বলতো, তুমি কি ইতোপূর্বে কখনো ব্যবসা-বাণিজ্য করেছিলে?

সোহাইব উত্তরে বললো, না, নিজের দৈনিক আবশ্যকীয় বা বাজার করা ছাড়া অন্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করিনি।

আবদুল্লাহ বললো, তবে এটা তোমার স্বভাবগত যোগ্যতা বলেই মনে হয়।

সোহাইব বললো, হ্যাঁ, এমনই কিছু একটা হবে।

আবদুল্লাহ কতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নিচু করে থাকল। এ অবস্থা দেখে সোহাইব অন্য কাজে যাওয়ার জন্যে উঠতে যাবে, এমতাবস্থায় তার মনিব তাকে ইঙ্গিতে বারণ করল। সোহাইব মনিবের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে

থাকল। কিন্তু আবদুল্লাহ তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে উপহাসছলে মনের প্রকৃত কথা চাপা দিয়ে তাকে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, সোহাইব! তুমি কি গোলামি করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছ?

সোহাইব উত্তরে বললো, মনিব! এমন কে আছে যে গোলামীতে বিরক্ত হয়ে আজাদী লাভের আশা না করে?

আবদুল্লাহ : আমার ইচ্ছা, তোমার স্বাধীনতা তোমাকে প্রত্যার্পণ করি, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি বড় দায়িত্ব দিতে চাই।

সোহাইব : তবে এই স্বাধীনতা আপনার কাছেই রেখে দিন, তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আজাদী কেনাবেচার জিনিস নয়।

আবদুল্লাহ বললো, ওহ্, সোহাইব! তুমি কি বলছ? আমি তো তোমাকে কলবীদের নিকট থেকে খরিদ করে এনেছি। জানি না, তারা তোমাকে কোথা থেকে কিনেছে– আরবদের নিকট থেকে, না রুমিদের নিকট থেকে।

সোহাইব : না, আপনি আমাকে খরিদ করেননি, কলবীরাও আমাকে খরিদ করেনি। কিছু ডাকাত আমাকে ধরে এনে কলবীদের নিকট বিক্রি করেছে। কলবীরা আমাকে অসহায় পেয়ে আমার অমতে আপনার নিকট বিক্রি করেছে। এই কেনাবেচাতে আমি কখনো সম্মত ছিলাম না। আপনারা আমাকে গোলাম মনে করতে পারেন, কিন্তু আমি নিজেকে স্বাধীন মনে করি। আপনি নিজে ধনদৌলত ও প্রভাব প্রতিপত্তির বলে আমার শরীরের উপর অধিকার লাভ করেছেন বটে, কিন্তু আমার মনের উপর কারো অধিকার চলতে পারে না।

আবদুল্লাহ : আচ্ছা, আজাদী যদি ক্রয়-বিক্রয় না হত, তবে এ সকল গোলাম বন্দি কেন? মোকাতাবাত অর্থাৎ টাকা-কড়ি বা দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে আজাদী হাসিল করে কেন?

সোহাইব বললো, তা তারাই ভাল জানে, আমি তো কেতাবাত করে কোন মাল আসবাব বা শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে আজাদী হাসিল করব না। আমি তো এখনো নিজেকে আজাদ মনে করি।

আবদুল্লাহ : হরব বিন উমাইয়া সত্যই বলেছে, তুমি খুবই সাহসী ও চতুর

লোক। কিন্তু আমি চাই...।

সোহাইব : হ্যাঁ, আপনি চাচ্ছেন আমার দ্বারা কোন বড় কাজ সমাধা করিয়ে নিতে। আমার উপর তো আপনার যথেষ্ট অধিকার আছে। আপনি যা কিছু করতে চান, আমি তা করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি আপনার নিকট কোন প্রকার প্রতিদানের ওয়াদা চাই না। লোকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা ধরনের আশার জাল পেতে থাকে। আমি ঐসব মোটেই পছন্দ করি না।

আবদুল্লাহ কিছু বলতে চাইল, কিন্তু সোহাইব সে সুযোগ দিল না। সে বলে উঠল, আপনার কোন বোঝা কি আমাকে হাল্কা করে দিতে হবে? অথবা আপনার মনের কথাটা যা আপনি বলতে ইতস্তত করছেন– তা আমি বলে দিব?

আবদুল্লাহ : তবে কি তুমি মানুষের মনের ভেদ জান?

সোহাইব : আমি ইয়ামান ও আবেসিনিয়ার তেজারতে খুব মুনাফা করে এনেছি। আপনার জন্য বহু জিনিসও খরিদ করে এনেছি। তাই আপনি এখন আমাকে শাম ও রুম দেশের দিকে বাণিজ্যের উদ্দেশে পাঠানোর মনস্থ করেছেন। আপনি ভাবছেন যে, আমি সেখানে গিয়ে আরো অধিক লাভ করে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে আসতে পারব। আপনি আপনার তেজারতের মালপত্র আমার হাওলা করতে প্রস্তুত এবং কোন ধরনের ক্ষতির আশংকাও করেন না। কিন্তু আমার জানটা আমার হাওলা করতে রাজি নন। আপনার ধারণা এই যে, আমি রুম দেশে স্বাধীনভাবে অনেকদিন কাটিয়েছি। ঐ দেশে গেলে আর ফিরে আসব না, ওখানেই থেকে যাব। আর আপনার বাণিজ্য সম্ভারও সেখানেই থেকে যাবে।

আবদুল্লাহ : না, না! তা নয়। মালপত্রের ব্যাপারে আমি তোমাকে খুবই বিশ্বাসী ও আমানতদার মনে করি।

সোহাইব : তবে কি আমাকে আপনার নিজ মাল মনে করেন না? যদি মাল মনে করেন, তবে আমার জানটাও আমার হাওলা করে দেন। যেমন- এ যাত্রায় আপনার মালপত্র আমার হাওলা করে দিতে চান। তারপর মাল ছামানা যোগাড় করুন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি এত অধিক মাল ও

টাকা-কড়ি এনে দিব যা আপনি ইতোপুর্বে কখনো পাননি। কারণ, আমি রুমদেশীয় লোকেরা কোন জিনিস পছন্দ করে আর কোন জিনিস পছন্দ করে না তা ভাল করে জানি। আর এটাও জেনে রাখুন যে, রুমদেশে থাকার অভিপ্রায় আমার নেই। ঐ দেশের প্রতি আমার মনের কোন টানও নেই। কারণ, শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমি জানতে পেরেছি যে, আপনাদের এই দেশে আমার বিশেষ এক কাজ। আছে তা না হলে এই দেশে আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে এতদিন টিকে থাকতাম না। আমার মত লোক আপনার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইলে অতি সহজেই পালাতে পারে। আপনার নিকট কোন পুলিশ বা সিপাই নেই, আপনাকে ধোঁকা দিয়ে আমি এই হেরেম শরীফ থেকে ভাগতে চাইলে অতি সহজেই ভাগতে পারি। আপনি শত চেষ্টা করেও আমার কোন সন্ধান পাবেন না। পেলেও আমাকে ধরতে পারবেন না।

আবদুল্লাহ : তুমি এখনি বললে, আমাদের এদেশে তোমার বিশেষ একটি কাজ আছে? সেটা কী কাজ?

সোহাইব : তা আমার জানা থাকলে বলেই ফেলতাম। আমি বাল্যকাল থেকেই জানতে পেরেছি যে, এই দেশে আমি জীবন কাটাব। এই দেশেই আমার মরণ হবে। আমার জিবনের অর্ধেক এই হেরেমেই কাটিয়েছি, বাকি অর্ধেক দ্বিতীয় হেরেমে কাটাব। আমার মরণ এই দেশে নিশ্চিত এবং হেজাজের মাটিতেই আমার কবর হবে।

আবদুল্লাহ : সোহাইব! তুমি কী বলছ? আমার যতদূর জানা আছে, আরব দেশে মক্কার হেরেম ব্যতীত অন্য কোন হেরেম নেই।

সোহাইব : অন্য কোন হেরেমের কথা আমি নিজেও জানি না। আমি আপনার নিকট শুধু ঐ কথাই বলছি যা আমি আমার বাল্যজীবনের শেষে যৌবনের শুরুতে রুম দেশের এক গণকের কাছে শুনেছি। এখনও আমি এর অর্থ কিছুই বুঝিনি। বুঝবার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু দেখলাম, একদিন কলবীরা আমাকে খরিদ করল। আমার মনিবেরা একে অন্যের নিকট বলতে লাগল, শীঘ্রই মক্কার হেরেমের অধিবাসী কুরাইশরা এলে আমাকে তাদের নিকট খুব চড়া দামে বিক্রি করবে। তখনি সেই গণকের কথা আমার মনে পড়ল। আমি ইচ্ছা করলে কলবীদের হাত থেকে অনায়াসে

মুক্ত হতে পারতাম। কিন্তু আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, ঐ গণকের ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষা করে দেখব। এ পর্যন্ত যা দেখেছি, তাতে তার কথা অনেকটা সত্য হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার সব কথাই সত্য হবে বলে মনে হচ্ছে। এ জন্যেই আমি বলছি, আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবেই আপনার নিকট ফিরে আসব। আপনার ইচ্ছা হলে আমাকে আজাদী দিতে পারেন। আমি এদেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে যাব না। ইচ্ছা হলে আগামীকাল তাড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। সন্ধ্যায় আবার আমি এখানেই ফিরে আসব। এখানেই আমি জীবন কাটাব। যতদিন না ঐ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা না ঘটে।

এ কথা শুনে আবদুল্লাহ্ বললো, আমি আজ তোমাকে যেমন সাহসী ও বাহাদুর দেখলাম, এমন আর কাউকে দেখিনি।

সোহাইব : ঠিক আছে।

আবদুল্লাহ : এসো, আমার সাথে মসজিদে চল। আমি কুরাইশদেরকে তোমার আজাদীর ব্যাপারে সাক্ষী করে রাখছি।

সোহাইব : আমার নিজ আজাদীর ব্যাপারে অন্যকে সাক্ষী করার কোন প্রয়োজন নেই।

পরদিন আবদুল্লাহ বিন জুদান কুরাইশদের মজলিসে গিয়ে বললো, আমি রুমী গোলাম সোহাইবকে আজাদ করে আমার হলিফ বানিয়েছি। আমার বাণিজ্যের সমস্ত মালপত্র তার হাওলা করে দিয়েছি।

কুরাইশরা এ ঘোষণা শুনে নতুন কিছু মনে করল না। কারণ, এই যুবকের প্রশংসা তারা হরব্ বিন উমাইয়ার মুখেও শুনেছে। সোহাইব তার মূল্যবান যৌবনকাল আবদুল্লাহ্ বিন জুদানের ব্যবসা-বাণিজ্যে কাটিয়েছে। তার ধন-সম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। তার চেষ্টাতেই আবদুল্লাহ্ কুরাইশ বংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনী ও সম্পদশালী বলে পরিণত হয়েছে। দান-দাক্ষিণ্যেও সে সকলের অগ্রবর্তী হয়েছে। আরবের কবিগণ আবদুল্লাহর প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে পুরস্কার লাভ করত।

আবদুল্লাহ্ তার প্রশংসামূলক কবিতা শুনে খুশি হয়ে সোহাইবকে বললো, এর অর্ধেক তোমারই প্রাপ্য। কারণ, তোমার পরিশ্রমের ফলেই আমি এ

প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছি।

আবদুল্লাহ্ সময় সময় সোহাইবকে জিজ্ঞাসা করত, সোহাইব! এদেশে তোমার এখনো কী কাজ বাকী আছে?

সোহাইব বলত, কোন না কোন কাজ নিশ্চয়ই আছে।

আবদুল্লাহ্ বলত, কি কাজ রয়ে গেল বল না কেন?

সোহাইব উত্তর করত, আমি বলতে পারলে আপনার কাছে গোপন করতাম না।

অবশেষে আবদুল্লাহ বিন জুদানের মৃত্যু হলে সোহাইব সম্পূর্ণ আজাদ হয়ে গেল। সে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে বিরাট ধনশালী হল। এখন সে ইচ্ছা করলে, যে রুম দেশে বাল্যকালে প্রতিপালিত হয়েছে সেখানে অথবা তার জন্মভূমি ইরাকে চলে যেতে পারত, কিন্তু সে তা না করে মক্কাতেই রয়ে গেল। এদেশ ছেড়ে যাওয়া তার পছন্দ হল না। সে তার ধন-সম্পদ ধীরে ধীরে আরো বাড়াতে লাগল। এখন সে বাণিজ্য ব্যবসায় বেশি দূরদেশে যায় না। অতিরিক্ত খাটুনিও দেয় না। আবদুল্লাহর নিয়ম ও রীতিনীতি সে বজায় রেখে উপবাসীকে খাদ্য দেয়, গরীবদেরকে মুক্তহস্তে দান করে ও দুস্থদের যথাসাধ্য সাহায্য করে। এভাবে সে কুরাইশদের খুব আস্থাভাজনে পরিণত হয়। তার ভাষা পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ আরবী না হলেও লোকেরা তার কথার মাধুর্যে শান্তি অনুভব করে।

একদিন সোহাইব কুরাইশদের মজলিসে আরকাম বিন আরকমের গৃহ সম্পর্কে আলোচনা শুনতে পেল। সেখানে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ তার নতুন ধর্ম প্রচার করছে। তার ধর্মমত, কুরআনের যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে সকল লোক তার নিকট আসা-যাওয়া করে তারাই হল তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। আলোচনা শুনে সোহাইবের মনে হল তার ঐ ভবিষ্যদ্বাণী কার্যে রূপান্তরিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। যা সে শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে রুমদেশীয় গণকের নিকট শুনেছিল। যার অপেক্ষায় যৌবন অতিবাহিত করে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

এই আলোচনা শুনে আরকামের গৃহে নিজে গিয়ে হযরতের কথাবার্তা শুনার

জন্য তার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল। অবশেষে সে একদিন মসজিদে হারামে যাবার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে পথ চলতে চলতে আরকামের ঘরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে দেখল, তার নিকটেই ইয়াছিরের পুত্র আম্মার দণ্ডায়মান। তাদের উভয়ের মধ্যে যে সকল কথাবার্তা হয়েছে, তা পূর্বে চতুর্থ অংকের শেষ ভাগে বর্ণিত হয়েছে। তারা উভয়েই ঘরে প্রবেশ করে হযরতের অমৃতবাণী শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। সোহাইব সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্য মুসলমানদের সাথে হযরতের খেদমতে বসে থাকল। সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সকলে চুপি চুপি কোথাও চলে গেল। কুরাইশরা সে দিন অনেক তালাশ করেও সোহাইবকে কোথাও পায়নি। পরদিনও তাকে তালাশ করে পাওয়া গেল না।

অবশেষে আবু জেহেল সব ঘটনা অবগত হল। একজন বললো, আজ দেখছি আবুল হাকামের শরীর ক্রোধে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে!

আবু জেহেল মজলিসের মধ্যে তার উরুতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্রোধভরে বলতে লাগল, কুরাইশরা শুন! সোহাইবও বেদীন হয়ে গেছে। আজ থেকে তাকেও ইয়াছিরের পরিবারের মত শাস্তি ভোগ করতে হবে।

দশ.

আজকের দিনের মত শুভদিন কবিলা খাছআম কখনো দেখেনি। আজ তারা বিনাযুদ্ধে শত্রুর উপর জয়লাভ করেছে। অগণিত গনিমতের মাল হস্ত গত হয়েছে। এ জয়ের জন্য তাদের কোন প্রকার পরিশ্রম করতে হয়নি। কোন বিপদে পড়তে হয়নি। রীতিমত কোন ধরনের যুদ্ধের আয়োজনও করতে হয়নি। যার যা ইচ্ছা গনিমতের মাল স্বহস্তে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালও নিয়ে যাচ্ছে। পরাজিত শত্রু নাজ্জাসির মাল আসবাব লুটপাটে আজ তাদের অবাধ অনুমতি ও অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা মিটছে না। কেউ কিছুতেই কম মাল নিতে চায় না। সম্ভব হলে নাজ্জাসির সমস্ত মালপত্র আত্মসাৎ করতে পারলে খুশি হয়। আজ নাজ্জাসির সেনাপতি আবরাহার সমস্ত সৈন্য দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে মক্কা থেকে পলায়ন করছে। তার সমস্ত শক্তি বিনাযুদ্ধেই শেষ হয়ে গেছে। সেনাপতি অযাচিত বিপদগ্রস্ত হয়ে অচল হয়ে গেছে। মৃত্যুর বিভীষিকা তার সামনে দেদীপ্যমান। কখনো কখনো প্রাণের একটু ভরসা এসে সজীবতা দেখা দিলেও মন অস্থির ও পেরেশান। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আকাশে উড়ে আবরাহার সৈন্যদলের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাদেরকে নিহত করছে। পাখির দল মেহেরবানী করে যাদেরকে রেহাই দিয়েছে তারা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল দ্রুতগতিতে পালাতে লাগল। কিছুক্ষণ পূর্বে খাছআমেরা

দেখেছিল, আবরাহার অগণিত সৈন্য বিপুল রণসম্ভারসহ পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। খাছআমের প্রবীণ জ্ঞানী লোকেরা আবরাহার সৈন্যদল প্রতিরোধ করা সমীচীন মনে না করে তাদের গতিপথ ছেড়ে দিল। তারা মক্কার মসজিদ ধ্বংস করতে যাচ্ছে। এ ভয়ানক অন্যায় ও পাপের কাজে কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল না। কিন্তু খাছআম বংশের চঞ্চলমতি ও নির্বোধ যুবক দলের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। একদল শত্রুপক্ষকে পথিমধ্যে বাধা দিতে গিয়ে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। অন্যদল শত্রুপক্ষের অনুগ্রহ ও মাল-সামানা লাভের লালসায় তাদের সাথে মিলিত হল। আরেক দল নিকটবর্তী পাহাড়ে আত্মগোপন করল, যাতে সুযোগমত অতর্কিতভাবে শত্রুদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে মাল-সামানা লুটতরাজ করতে পারে বা শত্রু পালাতে লাগলে কিংবা কোন ধরনের বিপদাক্রান্ত হতে দেখলে তাদের আক্রমণ ও লুটতরাজের সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকল। এই দল সময় সময় অতর্কিতভাবে শত্রুসেনার উপর আক্রমণ করে কিছু কিছু মালামাল লুট করে পাহাড়ের ঘাঁটিতে লুকিয়ে থাকত। এরা শত্রুপক্ষকে খুব উত্যক্ত করে তুলল।

আবরাহা এদের উপর অত্যন্ত ক্ষেপে গেল। প্রতিজ্ঞা করল, মক্কাবিজয় করে প্রত্যাবর্তনকালে এদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিবে যেন চিরজীবন স্মরণ থাকে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য স্মরণীয় ঘটনায় পরিণত হয়। কিন্তু আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করতে পারল না; বরং অভূতপূর্ব পরাজয় ও লাঞ্ছনা ভোগ করে পলায়ন করতে বাধ্য হল। এমন এক বিপক্ষ সৈন্যদল তার সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত ও ধ্বংস করতে লাগল, যাদেরকে সে দেখতেও পেল না। সবেমাত্র সে দেখেছিল যে, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির দল উড়ে এসে তাদের উপর কংকর নিক্ষেপ করে তাদেরকে চর্বি তৃণবৎ নিষ্পেষিত করছিল। আবরাহার একজন বিশিষ্ট লোক তাকে নিয়ে ইয়ামানের দিকে পলায়ন করল।

এ অপ্রত্যাশিত বিপদের কারণে আবরাহা শরণাপন্ন হয়ে পড়েছিল খাছআম কবিলার। এ কবিলার পার্শ্ববর্তী পথ দিয়েই সে পালাচ্ছিল। তার পূর্বকল্পিত প্রতিশোধ আক্রমণের পরিবর্তে খাছআম বংশের লোকেরাই তার দলের উপর আক্রমণ চালিয়ে লুটতরাজ ও প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করল।

আবরাহা অতি কষ্টে জীবন-মরণ সমস্যার মধ্য দিয়ে কোন মতে পালিয়ে ছানআ পর্যন্ত পৌঁছামাত্র তার বক্ষস্থল ফেটে গেল ও অবশেষে যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করল। সেদিন খাছআম বংশের লোকেরা নাজ্জাসির মাল-সামানা ইচ্ছামত হস্তগত করল। কোন মালই তারা লুট না করে ছাড়েনি। সোনা-রূপা, ঘোড়া, উট, বকরী– সবই লুট করে নিল এবং ঐসব বিক্রি করে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করল।

এই অভিযানে আবেসিনিয়ার বহু উট ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী মেয়ে-ছেলেরা তামাশা উপভোগ করার জন্য আবরাহার সৈন্যদলের সাথে এসেছিল। তাদের পিতা-মাতা ও স্বামীরা মনের শান্তি ও আনন্দ উপভোগের জন্য তাদেরকে সাথে আনা সঙ্গত মনে করেছিল। এ অভিযানে কেউ তাদের সম্মুখীন হবে বা তাদেরকে কোন প্রকার বিপদে পড়তে হবে– এমন ধারণা তাদের ছিল না। তারা মনে করেছিল, এ অভিযান শুধু চিত্তবিনোদন ও নানা প্রকার আনন্দ উপভোগের কারণ হবে মাত্র। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, বাইতুল্লাহ্ ধ্বংস করে এদেশের মূর্খ লোকদেরকে শস্তি দিবে, যারা তাকে কেবল পবিত্র মনে করে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করে এবং হেরেম জেনে সম্মান প্রদর্শ করে।

সফর হালকা হলে তাতে স্বভাবতই লোকেরা শারীরিক ও মানসিক আমোদ-উপভোগের সামগ্রী ও নানাবিধ নয়ন-রঞ্জন সাজ-সরঞ্জাম সাথে নিয়ে যায়। এ সেনাদলের সেনাপতি ও সর্দারগণও তাদের স্ত্রী-কন্যাগণকে সাথে এনেছিল, যাতে তাদের মুহাব্বত ও স্নেহ পুরুষদের চিত্তবিনোদন করতে পারে। বহু গায়িকা, নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্র চালনে নিপুণ মহিলাও তাদের সাথে এসেছিল। এ কারণে হাবশিদের এ অভিযান অতি আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। তারা বিন্দুমাত্রও ভাবতে পারেনি যে, বর্বর আরবেরা ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ধর্মালম্বী মেয়েদেরকে লুট করে নিয়ে যাবে। এ লুটপাটকারীদের সাথে মিলিত হয়ে খাছআম বংশের সোহাইম বিন সোহাইল ও শক্রসেনার উপর হামলা করার জন্যে বের হয়েছে। সেও আপন ভাই-বন্ধুদের মত বহুবিধ লুটের মাল সংগ্রহ করল। কিন্তু সকল জিনিস অপেক্ষা তার দৃষ্টি পড়ল এক ধাবমান উষ্ট্রীর প্রতি, যাকে এক কদাকার রুক্ষ ও বলিষ্ঠ হাবশি তাড়িয়ে নিচ্ছে। পলায়নরত হাবশিকে দ্রুত পথভ্রমণে অতিশয় ক্লান্ত ও সাহসহীন হয়ে বিশ্রামান্বেষী বলে মনে হল।

কিন্তু সে নিজ সর্দারগণের হুকুম পালনে তৎপর হয়ে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। তার মন চায় সে উষ্ট্রীর রজ্জু ছেড়ে দিয়ে কোথাও বিশ্রামের জন্য বসে পড়ে।

সোহাইম ভালভাবে নিরীক্ষণ করে দেখল, ঐ উষ্ট্রীর উপর এক অতি চমৎকার সুদর্শন হাওদা রয়েছে। ঐ হাওদার উপর হিরা-মুক্তাখচিত রেশমি পর্দা ঝুলানো আছে। তা দেখে তার বড় লোভ হল। সে তার হাতের নেজা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঐ হাবশীর নিকট উপস্থিত হল। হাবশী গোলাম তাকে দেখামাত্র উষ্ট্রীর লাগাম তার হাতে ছেড়ে দিয়ে তার আদেশ মত আগে আগে চলতে লাগল।

সোহাইম জিজ্ঞাসা করল, এই উষ্ট্রী ও হাওদা কার?

হাবশী গোলাম ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবী ভাষায় উত্তর করল, এই উষ্ট্রীর আরোহিণী আমাদের সর্দারের ভাতিজী।

সোহাইম এ উষ্ট্রী ও গোলামকে নিজের ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে মনে মনে ভাবল, গনিমতের মালের মধ্যে এই গোলাম উষ্ট্রী ও তার সাজ-সরঞ্জামই আমার জন্যে যথেষ্ট। হাওদা আরোহিণী মেয়ের আমার কোন প্রযোজন নেই। তাকে নিয়ে কোন কুরাইশ সর্দারকে তোহফা হিসাবে দিব। এমন কল্পনা করতে করতে সোহাইম নিজ গোত্রের তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছে গোলামকে থামার ইশারা করল। গোলাম উষ্ট্রীকে বসিয়ে দিয়ে নিজে কিছু দূরে সরে নতমুখী হয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকল যেন কোন হারানো জিনিস তালাশ করছে। সোহাইম তাকে ডেকে হাওদা নামাতে বললো। গোলাম উটনীর পিঠ থেকে হাওদা নামিয়ে আবার কিছু দূরে সরে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সোহাইম ধীরে ধীরে হাওদার নিকট এসে পর্দা উল্টিয়ে এক পলক দেখে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তার বদনমণ্ডল আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠল। খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল। কাবার প্রভুর কসম! এ তো মেয়ে নয়, এ যেন পায়রাবতী, কোমলদেহী পরীর চেহারা। তার শ্যামল চেহারায় যৌবনের লাবণ্য ও রক্তাভা ফুটে উঠেছে। মেয়েটি ভীত ও শংকিত হয়ে বসে আছে। লজ্জার কারণে সে কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ না করে ধীর ও শান্ত ভাব ধারণ করল।

সোহাইম এই কুমারীর প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করে নজর ফিরিয়ে নিল। পরে তাকে নম্রভাবে ইজ্জতের সাথে হাওদা থেকে বের করে বললো, বেটি! ভয় করো না। আমি তোমার সাথে কোন ধরনের দুর্ব্যবহার করব না। তোমাকে কোন প্রকারের কষ্টও দিব না। তারপর হাত ধরে ধীরে ধীরে তাকে নিজ গৃহে নিয়ে গেল।

ঘরে এসে তার স্ত্রীকে খুব সাবধান করে দিয়ে বললো, এই সুদর্শনা কবুতরীর সাথে খুব সদ্ব্যবহার করো, এটাই আমার উপদেশ। কারণ খাছআম বংশের কোন লোকের উপযুক্ত এই মেয়ে নয়। কোন কুরাইশ সর্দারের ঘরের জন্য উপযুক্ত। সোহাইম এ উটনী ও গোলাম এবং উপার্জিত মালপত্র সামলিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সাথে আবার লুটপাটের মাল সংগ্রহ করতে বের হল।

মাস খানেক অতিবাহিত হওয়ার আগেই সোহাইম কুরাইশ বংশের খলফ বিন ওয়াহ্হাব জুমাহির সাথে ছারাত নামক স্থানে দেখা করতে গেল। তখন হাবশী শাহজাদি দোসিজাকেও সঙ্গে নিয়ে খলফের ঘরে উপস্থিত হল।

খলফ পরিবার আরবদের দস্তুর মোতাবেক বিশেষ করে কুরাইশদের ভদ্রতানুযায়ী এদেরকে খুব আদর-অভ্যর্থনা করে মেহমানদারী করল। সোহাইম বিদায় গ্রহণকালে বললো, জুমাহা গোত্রের সর্দার! আমি আপনার জন্য কি এনেছি জানেন?

খলফ বললো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি আমার জন্যে অবশ্যই কোন মূল্যবান জিনিস এনেছ।

সোহাইম বললো, আমি আপনার জন্য সেই হাবশী সর্দারের ভাইয়ের বেটিকে এনেছি, যারা বাইতুল্লাহ্ আক্রমণ করতে এসেছে। কিন্তু কাবার প্রভু তাদেরকে পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত করে বিতাড়িত করেছেন।

খল্ফ : এ কি আবরাহার ভাতিজী?

সোহাইম : হ্যাঁ, সে আবরাহার ভাতিজী বটে।

খল্ফ : এর নাম কি?

সোহাইম : এর নাম তো আমি জানি না। কিন্তু আমি এর সুগঠিত দেহ ও

সুশ্রী চেহারা দেখে একে কবুতরী ডেকেছি। পরে আমি ভাবলাম, খাছআম বংশের বা অন্য কোন আরব বংশের লোক এর যোগ্য নয়। আল্লাহর ঘরের হেফাজতকারী কুরাইশ বংশের কোন এক সর্দারই হচ্ছে এর উপযুক্ত। আপনার সাথে আমার বহু দিনের মুহাব্বত। এ জন্য আমি একে আপনার কাছে এনেছি।

খল্‌ফ সোহাইমকে জিজ্ঞাসা করতে যাবে যে, এর মূল্য কত? কিন্তু সোহাইম তার আগেই বলতে লাগল, আবু উমাইয়া (খলফের ডাক নাম)! দেখুন, আমি এ শাহজাদীকে আপনার কাছে বিক্রি করতে আনিনি। বরং বন্ধুর জন্য হাদিয়া হিসাবে এনেছি। তাই আপনিও একে বন্ধুর হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করুন।

খল্‌ফ বললো, তোমার এ মহান দানের জন্য শোকরিয়া আদায় করি। খোদা আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখুন। তার চেহারায় খুশি ও কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটে উঠল। সে জানত, বেদুঈনদের তোহফা গ্রহণ করে তার প্রতিদান দেয়া যায়। তারপর সে ঐ কুমারীকে ঘরে নিয়ে যেতে বললো, কিন্তু সে কুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাতও করল না।

খল্‌ফ অনেক সময় সোহাইমের সাথে মেহমান হিসাবে আলাপ-আলোচনা করে কতক্ষণ নতমুখী হয়ে থাকল। সোহাইমের ধারণা হল, তার এ অপূর্ব তোহফার দ্বারা খলফের মনে এমন কোন প্রতিক্রিয়ার উদয় হয়নি, যেমনটা সে আশা করেছিল।

পরক্ষণেই খল্‌ফ হঠাৎ মাথা তুলে বললো, সোহাইম! আজ আমি তোমার যেমন অনুগ্রহ লাভ করেছি, ইতোপূর্বে আর কখনো এমনটি পাইনি। দেখ, আমরা আবরাহার সাথে যুদ্ধ করিনি এবং বায়তুল্লাহ রক্ষার্থে কোন ব্যবস্থাও আমরা অবলম্বন করিনি। বরং আমরা এটাই ঘোষণা করেছিলাম যে, আমরা শত্রুর পথ অবরোধ করব না, খোদার ঘর খোদাই রক্ষা করবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে খোদার ঘর খোদাই রক্ষা করেছেন। আমরা পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে দেখছিলাম কীভাবে এই পবিত্র ঘরের মালিক খোদা তাআলা একে রক্ষা করলেন এবং আবরাহা ও তার সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করে বিতাড়িত করলেন। দুশমনেরা পালিয়ে যাওয়ার পর আমরা মক্কায় নিজ নিজ ঘরে ফিরেছি। ঐ সময় আমাদের অনেকের মনে এ বিষয়ে অতীব দুঃখ ও অনুতাপ হয়েছিল যে, এই পবিত্র ঘরের হেফাজত করার যে

গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর ছিল, আমরা তা পালন করতে পরিনি। তুমি এ হাবশী আমীরজাদীকে আমার কাছে উপস্থিত করে আমার অন্তরের প্রতিহিংসার আগুন দমন করার একটি সুযোগ করে দিয়েছ। এ পবিত্র ঘরের মালিকের কসম! যার হেফাজত আমি করিনি, এ হাবশী আমীরজাদীকে এমন লাঞ্ছিত করব, যেমন অন্য কোন হাবশী মেয়ে এর আগে কখনো হয়নি। প্রথমে আমি এই মেয়েটিকে মক্কার মাটিতে পদক্ষেপ করতে দিব না। কেননা এ পবিত্র হেরেমের প্রভু স্বীয় হেরেম থেকে অপবিত্র হাবশীদেরকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন।

সোহাইম বললো, আবু উমাইয়া! বড় দুঃখের কথা। আমি যদি জানতাম যে, আপনি এ সুন্দরী শাহজাদীর সাথে দুর্ব্যবহার করবেন, তাহলে একে কখনোই আপনার নিকট আনতাম না, নিজের ঘরেই রেখে দিতাম।

খলফ হেসে বললো, ওয়াহ সোহাইম! এটা সর্বশক্তিমান খোদাওন্দ করিমেরই নির্দেশ যে, এই আমীরজাদী এই হেরেম শরীফের নিকটে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। যেমন বেআদবী তার স্বদেশী ও বংশের লোকেরা হেরেম শরীফের সাথে করতে চেয়েছিল। খোদার কসম! আমি যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ বেটি কখনো আজাদীর আশা করতে পারবে না বা আজাদ সন্তান প্রসব করতে পারে না।

সোহাইম : তবে মনে হয় আপনি একে আপনার নিজের জন্য পছন্দ করেননি। তা হলে আমাকে ফেরত দিন।

খলফ বিদ্রুপের সাথে হেসে বললো, বাহ্! সোহাইম! আমি একে তোমার জন্যও পছন্দ করি না। আমি তো বলেছি, যতদিন আমি জীবিত থাকব, এ বেটি আজাদ সন্তান প্রসব করবে না। এই মাঠে আমার অনেক উট-ছাগল আছে। আমার কালা, গোরা, সব রকম গোলাম এগুলোকে চরায়। এ বেটিও তাদের সাথে উট-ছাগল চরাবে।

সোহাইম তার বন্ধুর সাথে এ বিষয়ে আরো কিছু আলাপ করতে চাইল, কিন্তু খলফ তার কথার গতি পরিবর্তন করে ইয়ামান ও হেজাজের নানা প্রকার ঘটনাবলী আলোচনার অবতারণা করে সোহাইমের মনের গতি ফিরিয়ে দিল। ঐ দিন সন্ধ্যায় খলফ নিজের লোকজনকে খানাপিনা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তার স্ত্রীকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্নমনা দেখতে

পেল। স্ত্রীকে তার চিন্তা ও বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে এ প্রশ্নের কোন উত্তর না করে বললো, আবু উমাইয়া! এই হাবশী সুন্দরী মেয়েটির সাথে (যাকে সোহাইম আজ এনে দিয়েছে) তুমি কেমন ব্যবহার করবে?

স্ত্রীর ক্রোধ ও বিষণ্নতা বাড়ানোর জন্যে খলফ বললো, উম্মে উমাইয়া! আমি এর সাথে খুব সদ্ব্যবহার করব। সে হাতিওয়ালা হাবশী সর্দারের ভাতিজী।

উম্মে উমাইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বললো, বাহ্! এখন বুঝি এই কথা! যারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে মক্কার হেরেমের সাথে বেয়াদবি করতে ও বাইতুল্লাহ ধ্বংস করতে এসেছিল, তাদের প্রতি আমরা সৌজন্য দেখাব?

স্ত্রীর এমন উক্তি শুনে খল্ফ তার দিকে ফিরে মাথা নেড়ে বললো, উমাইয়ার মা! কোন চিন্তা করো না। তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা হবে না। আমি শুধু তোমার সাথে ঠাট্টা করছিলাম। আসল কথা এই যে, এই মেয়েটি এতকাল শুধু ইজ্জত ও সম্মান ভোগ করেছে। যে সময় সোহাইম তাকে আমার নিকট তোহফা হিসাবে উপস্থিত করল, তখনি কসম খেয়ে বলেছি, এ বেটি এখন থেকে জিল্লতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে থাকবে। কেননা আমি হেরেম শরীফের হেফাজত ও সম্মান রক্ষার্থে নিজের শক্তি ও বাহাদুরি কোন কাজে লাগাতে পারিনি। এজন্য কাফফারা হিসাবে হাবশীদের এই শাহজাদীর দ্বারা তাদের অপমান করতে চাই। এছাড়া আর কোন উপায় আমি দেখি না।

উম্মে উমাইয়া বললো, তাহলে একে আমার চাকরানী বানিয়ে দাও।

খল্ফ : না, উমাইয়ার মা! ও চাকরানী হয়ে তোমার খেদমত করলে কি এর বেইজ্জতী হবে?

উম্মে উমাইয়া : একে চাকরানী বানিয়ে দাও। দেখবে সে আমার হাতে কেমন বেইজ্জতি ও জিল্লতির গ্লানি ভোগ করে।

খল্ফ : কিন্তু আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এ বেটি আমাদের ছারাত অঞ্চলের মাঠে থাকবে। মক্কার হেরেমে সে কদম রাখতে পরবে না। কেননা এই পবিত্র হেরেমের প্রভু খোদ নিজের হাবশীগণকে মক্কা থেকে দূরে বিতাড়িত করে দিয়েছেন। আমি প্রভুর মর্জির খেলাফ কাজ করতে চাই না। এর পা অপবিত্র। যদিও সে বাঁদী হোক না কেন। এজন্য

আমাদের অন্য গোলাম বাঁদীর সাথে একে উট ও বকরী চরাতে হবে।

উম্মে উমাইয়া খুশি হয়ে বললো, তুমি সত্যিই কুরাইশদের সর্দার হওয়ার উপযুক্ত লোক।

রাবাহ নামে খলফের এক হাবশী গোলাম ছিল। তখন তার বয়স হয়েছিল বিশ বছরের কিছু বেশি। সে খুব বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক। কাজকর্মে দক্ষ ও দূরদর্শী। খল্ফ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আজাদী দান করে ছারাত ময়দানের রক্ষক নিযুক্ত করেছে।

পরদিন প্রত্যুষে খলফ তার এ আজাদ গোলামকে ডেকে বললো, দেখ রাবাহ, তোমাদের হাবশী বংশের এক আমীরজাদী গতকাল আমার কাছে আনা হয়েছে। তোমার কওমের লোকেরা যা করেছে তা তুমি জান। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই বেটি দ্বারা আমার ভেড়া, ছাগল ও উট চরাব। আমি এই বেটিকে তোমার হাওলা করে দিব। তুমি একে এমনভাবে লাঞ্ছিত করবে, আমি যেন বুঝতে পারি যে, সে এমন ব্যবহারেরই উপযুক্ত।

রাবাহ বললো, তবে কেন দেরী করছেন সর্দার? আপনি তো আপনার সকল গোলামের সাথে আমার ব্যবহার দেখেছেন। আমি কি বিশ্বস্ততা ও চেষ্টা তদ্বিরের সাথে আপনার গোলামের দ্বারা সর্বপ্রকার কাজ হাসিল করে আপনার খেদমত ও কল্যাণ করিনি?

খল্ফ : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করেছ। এই বেটিকে নিয়ে যাও। একে রাখালের পোশাক পরিয়ে সর্বদা রাখালদের মধ্যে চলাফেরা করতে পাঠিয়ে দিবে।

রাবাহ : হুজুর এর দ্বারা এ বেটির বিশেষ কোন জিল্লতি হবে বলে আমি মনে করি না। আমার মনে হয়, আরেকটা কাজ করলে আপনার উদ্দেশ্য সাধিত হবে। অনুমতি দিলে তা বলেতে পারি।

খল্ফ : বল তা কি?

রাবাহ : আপনি জানেন, আমি হাবশী সম্প্রদায়ের কোন আমীর বা সর্দার নই। আমি একজন সাধারণ লোক। আমার শিরায় নীচু বংশের হাবশী রক্ত প্রবাহিত। আমি যদি এদেশে না এসে হাবশে থাকতাম, তবে এ শাহজাদীর বাড়িতে গোলাম হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও দিলে পোষণ করতে পারতাম না।

খল্‌ফ শুনে খুশি হল এবং উপহাস করে বললো, তবে কি তুমি একে তোমার স্ত্রী হিসাবে পেতে চাও?

রাবাহ্ : হ্যাঁ, যদি আপনি হাবশী সর্দার ও সেনাপতির জিল্লতি চান, তবে একে আপনার হাবশী গোলামের সাথে বিবাহ্ দেন।

খল্‌ফ : চল, একে আমি তোমার সাথে বিবাহ্ দিলাম। আজ থেকে তুমি এর স্বামী হয়ে গেলে। একটু বেলা হলে খুশি মনে নিজ বিবিকে নিয়ে চলে যেও।

এ হাবশী গোলাম অতি চতুর ও দুরদর্শী ছিল। সে ইতোপূর্বে আপন মনিবের সাথে কোন ধরনের চালাকি ধূর্ততা বা হিলাবাজি করেনি। কখনো মিথ্যে কথাও বলেনি। কিন্তু এবার এই শাহজাদীর সম্পূর্ণ অবস্থা বুঝতে পারল। তার মনিব এ বেচারিকে লাঞ্ছিত করতে চায়। এটা তার বরদাশত হল না। সে মনে মনে ভাবল, এমন একটা উপায় বের করতে হবে, যাতে এই বেচারি জিল্লতি থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু প্রস্তাবিত উপায় ছাড়া অন্য কোন উপায় তার মাথায় খেলল না। যখন এ শাহ্জাদী তার বিবি হল, তখন তার মনে স্থিরতা আসল। সে শান্তি লাভ করল। সে ভাবল, এই শাহ্জাদীকে নিয়ে সে দেবীর মত পূজা করবে। আপন মুহাব্বত সৌজন্য খেদমত ও তাজিম এর জন্য উৎসর্গ করে দিবে। এ সম্মানিত ভদ্র মহিলার সামনে অতি নগণ্য গোলামের মত চলবে। হয়ত এমন সময় আসতে পারে, যখন তাকে উদ্ধারের কোন অভিনব পন্থা উদ্ভাবিত হবে।

রাবাহ্ শাহ্জাদীকে নিয়ে তার দরিদ্র কুটিরে অবস্থান করতে দিল। নিজে তার সাথে যথাসাধ্য ভদ্রতা-নম্রতা ও সম্মানের সাথে ব্যবহার করতে লাগল। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তার সামর্থানুযায়ী শাহ্জাদীর পছন্দনীয় খাদ্যসামগ্রী তার সম্মুখে হাজির করত। সারাদিন এমন কোন কাজ হতে দিত না যা শাহ্জাদী খারাপ মনে করতে পারে। রাতে রাবাহ্ ঘরের দরজায় পড়ে থাকত। সে সর্বদা স্ত্রীর সুখ-শান্তি বিধানে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু কখনো তার নিকটে যেত না, তাকে স্পর্শও করত না। ঐ কুমারীও দিন দিন যুবক রাবাহর সৌজন্য ও বিনম্র ব্যবহারে তার ভক্ত ও অনুরক্ত হতে লাগল এবং অতি নম্রভাবে কালাতিপাত করতে লাগল। উভয়ের দাসত্ব জীবন এক প্রকার আশ্চর্য ধরনের ছিল। খল্‌ফ ও অন্য কুরাইশ সরদারগণ এবং রাবাহর অধীনস্থ খলফের গোলাম বাঁদীরা এই কুমারীকে খলফের স্ত্রী

বলে মনে করত। কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ আচার-আচরণ দেখলে মনে হতো, ঐ কুমারী রাবাহর মনিব। খোদ রাবাহও তাকে তেমনি জানত। রাবাহর প্রতিনিয়ত সৌজন্য ও সদয় ব্যবহারে কুমারীর হৃদয়ে তার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মাতে লাগল। অবশেষে শাহজাদী তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু যুবক রাবাহ নিজেকে এ শাহজাদীর অযোগ্য ও নালায়েক ভেবে দূরে থাকার চেষ্টা করত এবং সর্বদা ভক্তি ও আন্তরিক মুহাব্বতের সাথে তার খেদমত করে যেত।

এক সময় কুমারী তাদের এই অভিনব ও অনভিপ্রেত দাম্পত্য জীবনের প্রতি বীতরাগ হয়ে রাবাহকে বললো, তুমি আমাকে অনবরত এহসান ও তাজিম করে কষ্ট দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই জান, আমি তোমার এমন কৃপা ভিখারিনী না হয়ে অন্য ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করি।

যুবক রাবাহ খুব বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যবহার চান?

যুবতী কিছুটা উপহাসছলে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় দাম্পত্য জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তার আভাস প্রদান করল। সে আরো বললো, বর্তমানে তারা উভয়েই বিদেশে পরাধীন জীবন-যাপন করছে। কেউ কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা বংশ গৌরবের প্রধান্য লাভের অধিকারী নই।

যুবক রাবাহ বললো, আমি তোমাকে এজন্য বিয়ে করেছি যে, অন্য কেউ যাতে তোমাকে কোন ধরনের বেইজ্জতি করতে না পারে।

যুবতী উত্তর করল, নিঃসন্দেহে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করেছ। আমি সেজন্যও তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। সুতরাং আমাদের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়।

যুবতীর এই কথাগুলো শুনামাত্র রাবাহর চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রুবিন্দু তার গণ্ড বেয়ে পড়তে লাগল। তা দেখে যুবতীর চেহারাও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আজ বহুদিন পর তাদের মধ্যে অনভিপ্রেত দীর্ঘ ব্যবধান তিরোহিত হল।

একবার খলফ তার ছারাত ময়দানের বাগবাগিচা ও ক্ষেত-খামার স্বচক্ষে পরিদর্শন করার জন্য এসে এখানে কিছু দিন অবস্থান করল। রাবাহর কাজকর্ম ও আমানতদারী ইত্যাদি দেখে খলফ খুশি হয়ে তাকে উট বকরী ভেড়া ও ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল থেকে কিছু পুরস্কার দিল। রাবাহ মনিবের

প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে ঘরে ফিরতে উদ্যত হল। খলফ তাকে উদ্দেশ্য করে উপহাসছলে বললো, মিয়া রাবাহ! তোমাদের উভয়ের মধ্যে তুমি না তোমার স্ত্রী বন্ধ্যা? তোমাদের বিবাহ হয়েছে অনেক দিন হল। কিন্তু তোমাদের কোন সন্তানের জন্ম হয়েছে বলে শুনিনি।

রাবাহ লজ্জাবনত হয়ে থাকল, কোন উত্তর দিল না।

খলফ পুনরায় এ প্রশ্ন করলে রাবাহ সাহসের সাথে উত্তর দিল, আমরা নিঃসন্তান হই বা সন্তান লাভ করি, তাতে আপনার কী আসে যায়?

এমন উত্তর শুনে খলফ একটু চমকে উঠল। সে আলাপের গতি পাল্টিয়ে বললো, রাবাহ কী বলছ? তুমি রাগের চোটে ভুলে গেছ যে, তুমি আজাদ হলেও তোমার ঐ কবুতরী স্ত্রী আজও আমার বাঁদী। তাহলে আমার এ বিষয় চিন্তা করতে হবে না কেন?

রাবাহ উষ্মার সাথে বললো, তবে কি গরু-ছাগলের মত বাচ্চা জন্মানোর উদ্দেশ্যেই তাকে আমার সাথে বিবাহ দিয়েছেন?

খলফ বললো, মনে হয় তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আছ! আমি বন্ধু হিসাবে তোমাদের অবস্থা জানতে চেয়েছি মাত্র।

রাবাহ বললো, যদি তাই হয় তবে কোন আপত্তি নেই।

পরে রাবাহ মাথায় হাত দিয়ে দুঃখপূর্ণ কণ্ঠে বললো, আফসোস! আমি তো ভুলেই গেছি যে কবুতরী এখনো বাঁদী। আর তার সন্তানও তার মত গোলাম হবে।

খলফ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো, রাবাহ! বাস্তবিকই কি তার পুত্র-সন্তান জন্ম হয়েছে?

রাবাহ উত্তর করল, হ্যাঁ পুত্র হয়েছে। আমি যদি আমার মন বাঁধতে পারতাম, তবে পুত্রকে জীবন্ত কবরে পুঁতে রাখতাম। যেমন আপনারা আপনাদের মেয়ে সন্তানদের জীবন্ত দাফন করেন। কোন মানুষ এতে সন্তুষ্ট হতে পারে না যে, সে উট বকরীর মত সন্তান জন্মাবে।

খলফ পেরেশান হয়ে বললো, আফসোস রাবাহ! তুমি বিনা কারণে আমার মনে কষ্ট দিচ্ছ, আর নিজের জীবনের উপর ও মুসিবত টেনে আনছ। খোদার কসম! তোমার দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমার স্মরণে থাকার কথা, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, এই মেয়েটি

দ্বারা উট, বকরী চরাবে। কিন্তু তুমি তাতে রাজি হওনি; বরং তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে আমাকে বাধ্য করেছিলে। তুমি বলেছিলে, এ দ্বারা তার অপমান বেশি হবে এবং আমার উদ্দেশ্যও সফল হবে। তবে এখন তোমার অসন্তুষ্টি ও নারাজির কি কারণ হতে পারে?

এ কথা শুনে রাবাহ্ নীরব হয়ে গেল। তার বিগত জীবনের সমস্ত কথা স্মরণ হতে লাগল। এই হাবশী শাহজাদীকে অপমান থেকে বাঁচানোর জন্য কি কৌশল অবলম্বন করেছিল তা স্মরণ হল। তার মনিবের সাথে এই ব্যাপার ছাড়া সে আর কখনো কোন প্রকার ধোঁকাবাজি করেনি, মিথ্যাও বলেনি। এ সকল বিষয় চিন্তা করে সে কৃত্রিম হাসি হেসে বললো, এখন আর কি বলব। এই শাহজাদী আমার হৃদয় জয় করেছে। আমি তার মুহাব্বতে পড়েছি।

খল্ফ বললো, আচ্ছা! তুমি তাহলে একে এখন মুহাব্বত করছ। কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে, একে খুব লজ্জিত ও অপমানিত করবে।

রাবাহ্ বলতে লাগল, এটা অবশ্য চিন্তার বিষয় যে, এই মেয়েটি শাহজাদী ছিল, পরে বাঁদী হয়েছে এবং এমন এক গোলামের সাথে বিবাহ হয়েছে যে তার গোলাম হওয়ারও আশা করতে পারত না। প্রথমে সে এ সম্পর্ক বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছে। পরে সন্তুষ্টির সাথে সৌভাগ্য মনে করে কবুল করেছে। এমন সম্ভ্রান্ত অথচ নিপীড়িত মেয়েকে কেন আমার দ্বারা আরো অপমানিত করাতে চান?

এ কথা শুনে খল্ফ নিরাশ ও দুঃখিত হয়ে বললো, আচ্ছা বলত, তোমার গোলামী ও তোমার স্ত্রীর উচ্চ মর্যাদার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা এখন বিলুপ্ত হয়েছে কি?

রাবাহ্ হেসে বললো, এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, গোলামী মানুষের মধ্যে সাম্য স্থাপন করে, আর উঁচু মর্যাদার বিভিন্ন স্তর মিটিয়ে ফেলে। কিন্তু আজাদী বা স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র স্থাপন করে। আমীর-গরীব, শাসক-শাসিত, শক্তিমান-দুর্বল ও প্রভু-মনিব-এ জাতীয় বহুবিধ স্তর সৃষ্টি করে। ইয়া আল্লাহ! এ আঁধার রাতি পোহায়ে কখন প্রভাতের উজ্জ্বল আলো উদিত হবে?

খল্ফ বললো, রাবাহ্! তুমি এসব কী বলছ! কোন রাত্রি আর কোন প্রভাতের কথা বলছ?

রাবাহ বললো, রাত বর্তমান যামানা, যাতে আমরা ও আপনারা বিরাজ করছি। এখন গোলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য আর আজাদ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পার্থক্য বিরাজমান। প্রভাত ঐ সময়কে বলেছি, যা ভবিষ্যতে আসবে। যখন আজাদ ও গোলাম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য স্থাপিত হবে, তখন মানুষ শুধু নিজ স্বভাব চরিত্র ও কৃতকর্মের দ্বারা একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। ধন-দৌলতের দ্বারা পারবে না।

খল্ফ রাবাহর বক্তৃতা শুনে হাসতে লাগল। বললো, রাবাহ্! আজ তুমি নজুমীর মত কথাবার্তা বলছ। তোমার এ অন্ধকার রাত্রি ও উজ্জ্বল প্রভাতের কথা রেখে দাও। তোমার ঐ বাচ্চা যাকে তুমি জিন্দা কবরস্থ করতে চাচ্ছ, তার কি নাম রেখেছ? তার অবয়ব আকৃতি কেমন?

রাবাহ : আপনি আমার অন্ধকার রাত্রি ও উজ্জ্বল প্রভাতের কথায় বিদ্রুপ করছেন, ইনশাআল্লাহ এই রাত্রি নিশ্চয়ই শেষ হবে। আশা করি, আমরা অন্ধকারের অবসান ও প্রভাতের উদয় দেখতে পাব। আমরা যদি নাও দেখি আমার পুত্র বেলাল এবং আপনার পুত্র উমাইয়া অবশ্যই দেখবে।

খল্ফ মাথা নেড়ে গর্বিতভাবে বললো, থাম রাবাহ্! এসব বিষয় অন্য কারো সাথে আলোচনা করো না। আমি তোমার এই নবজাত শিশুর উসিলায় তোমার মাহিনা কিছু বাড়িয়ে দিলাম। তুমি জান, আমি ঐ একটা বড় শপথ করে ফেলেছি। নতুবা আমি তোমার বিবি ও বাচ্চাকে আজাদ করে দিতাম। তুমি আপন বিবি-বাচ্চা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। আমি যতদিন জীবিত আছি, ততদিন তোমার কোন প্রকার কষ্ট হবে না। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি করতে পারছি না।

রাবাহ কিছুটা উপহাসের সাথে বললো, এই মেয়েটি আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতেও আসেনি, সে যুদ্ধ জানেও না। কিন্তু বর্তমান যামানার অদ্ভুত ব্যবস্থা এই যে, অপরাধ করে বড় লোকেরা, আর শাস্তি ভোগ করে অবলা মহিলারা ও অসহায় গরীব লোকেরা।

খল্ফ বললো, আজকের দিনে তোমার মত এমন জ্ঞানী লোক আমি খুব কম দেখেছি। আচ্ছা যাও, সুখে ও আরামের সাথে জীবন-যাপন করতে থাক। তোমার এমন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করো না। কেননা এতে করে তোমার উপর কোন বিপদও আসতে পারে।

রাবাহ ও তার স্ত্রী হামামা (কবুতরী) এভাবে সুঃখ-শান্তিতে দিনাতিপাত করতে থাকল। তাদের দুই পুত্র সন্তান জন্ম নিল। প্রথম জন বেলাল, দ্বিতীয় জনের নাম অজ্ঞাত। তাদের সমশ্রেণী লোকদের মত আপন পুত্রগণকে খুব যত্ন করে লালন-পালন করতে লাগল। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের পুত্রগণকেও তার প্রভু খলফের ক্ষেত-খামারের কাজে নিয়োজিত করল। কিছুকাল পরে এই দম্পতি পুত্রদ্বয়কে প্রভু খলফের কাছে প্রতিনিধিস্বরূপ রেখে ইহধাম ত্যাগ করল। তারপর খল্‌ফও তার যুবক পুত্র বলিষ্ঠ ও রুক্ষ স্বভাবের উমাইয়াকে বর্তমান রেখে পরলোক গমন করল। রাবাহর বর্ণিত অন্ধকার রাত্রির অবসান ও উজ্জ্বল প্রভাতের উদয় রাবাহ বা খল্‌ফ কেউই দেখে যেতে পারেনি।

বেলাল ঐ সুপ্রভাতের উদয় দেখে তার উজ্জ্বল আলোকে নিজ অন্তর আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছে। তবে খলফের পুত্র উমাইয়া ঐ প্রভাত দেখেছিল বটে, কিন্তু তার উজ্জ্বল আলো তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকারে তা আচ্ছাদিত ছিল। বেলালের এমন সৌভাগ্য লাভ হয়েছে যে, তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরম বন্ধুরূপে পরিগণিত হয়েছেন। আর উমাইয়া হযরতের চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সে তার শত্রুতার উত্তরাধিকারী নিজ ভ্রাতা উবাইকে বর্তমান রেখে বদর যুদ্ধে বেলালের হাতে নিহত হয়। ইয়াসির পরিবারকে আবু জাহেল কিভাবে শাস্তি দিচ্ছে তা দেখার জন্য একদিন উমাইয়া আবু জাহেলের ঘরে গেল। আবু জাহেল কর্তৃক অমানুষিক যুলুম দেখে উমাইয়া মাথা নেড়ে আবু জাহেলকে বললো, আগামীকাল তুমি জুম বংশে এসে আমরা কিভাবে বেদীনদের ও তাদের নেতা বেলালকে শাস্তি প্রদান করি, তা দেখে যেও।

এগার.

তোমরা এই বাচ্চাটাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছ। এই ননীর পুতুলের প্রতি তোমরা কিভাবে নির্দয় অত্যাচার ও জুলুম করছ! আমি তোমাদের মত কঠিন-হৃদয় ও নির্দয় লোক আর কখনো দেখিনি। একথা বলতে বলতে উম্মে আনমার বনি আমের বংশের গোঁয়ার লোকদের দলের ভেতরে ঢুকে কাউকে ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে দিল, কাউকে কাপড় টেনে সরিয়ে দিল। লোকগুলো একটি ছোট ছেলেকে প্রহার করছে দেখে উম্মে আনমার সেখানে গিয়েছিল। বনি আমের গোত্রের এই লোকগুলো নজ্‌দ থেকে এসেছে। তারা তেজারত করার জন্য ইরাক থেকে উট বোঝাই করে শস্যসম্ভার এনেছে। তারা বাণিজ্যদ্রব্য বিক্রয় করে পণ্যবাহী পশুগুলোও বিক্রি করে ফেলেছে। শেষে এই বাচ্চা ছেলেটাকেও বিক্রি করার জন্য এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু কোন খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছিল না দেখে তাদের মন খারাপ হয়ে গেছে। এ কারণে তার প্রতি নানা ধরনের জুলুম করতে আরম্ভ করেছে। পরে তারা ভাবল, একে সাথে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে পথিমধ্যে কোন আরব তাজেরের নিকট বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু ছেলেটা কোন মতেই তাদের সাথে যেতে রাজি নয়। তাই তারা এ নিরীহ বালকের প্রতি অতি নির্দয়ভাবে জুলুম করছে। ছেলের গোঁড়ামি দেখে বনি আমেরের বণিকগণ আরো বেশি রাগান্বিত হয়ে তাকে আবার প্রহার করতে

লাগল। ঠিক তখনি উম্মে আনমার সেখানে হাজির হয়। বালকের দুর্দশা দেখে তার মন গলে গেল এবং বাঁচানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

একজন নারীর পক্ষ থেকে এমন চেষ্টা-তদবির দেখে বনি আমেরের এক লোক তাকে বললো, এই ছেলের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এমন খারাপ মেয়ে মানুষ তো আমরা আর কখনো দেখিনি। হেরেমের বাইরে হলে তোমাকে উচিত শাস্তি দিতাম।

উম্মে আনমার ক্রোধান্বিত হয়ে কৃত্রিম হাসি হেসে উপহাস করে বললো, আমি হেরেম শরীফের ভেতরে আছি বলে তোমরা আমার উপর অত্যাচার করতে পারনি। কিন্তু তোমরা তো সবাই বলিষ্ঠ দেহ। সাদা-কালো লম্বা দাড়িওয়ালা, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। অথচ একটা নিরীহ ও দুর্বল বাচ্চা ছেলেকে হেরেমের মধ্যে মারপিট করতে লজ্জা হয় না?

বণিকদের মধ্যে থেকে আরেকজন বলে উঠল, এই বাচ্চার খানাপিনার দায়িত্ব যদি তোমার উপর পড়ত, তবে তুমি এত দয়ালু হতে না। এটা একটা অকেজো গোলাম। অতি অবাধ্য। আমাদের সাথেও যেতে চায় না, এখানকার কেউ একে পছন্দ করে খরিদও করতে চায় না।

উম্মে আনমার বললো, কে চায় না? আমার কাছে তো একে ভালই লাগছে।

আমেরি বণিক বললো, তবে তুমি একে খরিদ কর না কেন?

জবাবে উম্মে আনমার বললো, আমি প্রস্তুত, তোমরা একে আমার কাছে বিক্রি করে দাও।

উম্মে আনমার অল্প কয়েক দেরহাম দিয়ে সস্তা দামেই কিনে নিল। বনি আমের বণিকেরা তাদের এই বোঝা থেকে নিস্কৃতি পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। আর উম্মে আনমার তার খরিদকৃত বাচ্চা গোলামকে সাথে নিয়ে তার নিজ বাড়ি জোহরা কবিলার মহল্লায় চলে এল। দীর্ঘ দিনের সফর, উপবাস ও মারপিটের দরুন এই গোলাম বাচ্চাটা দুর্বল কংকালসার হয়ে গেছে। উম্মে আনমার তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার সময় জোহরা কবিলার স্ত্রী-পুরুষ হাসি-তামাশা করে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ওয়াহ! উম্মে আনমার! এই মুর্দাকে কোথা থেকে টেনে হেঁচড়ে আনছ?

উত্তরে সে বললো, এতে তোমাদের কি? এটা আমার খরিদা গোলাম। সে আমার কাছে থাকবে। আমার খেদমত করবে। আমিও তাকে আপন

ছেলের মত লালন-পালন করব।

উম্মে আনমার ছেলেকে গোসল করিয়ে ভাল কাপড় পরতে দিল ও ভাল খাবার দিয়ে শান্ত করল। তার ফ্যাকাশে চেহারা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে লাগল। উম্মে আনমার তার আপন ছেলে আবদুল উযার সাথে এই গোলামের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিল। তারপর তারা সহোদরের মত মিলেমিশে খেলাধুলা করে শান্তিতে দিনাতিপাত করতে লাগল।

উম্মে আনমার মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে ছোট ছেলে-মেয়েদের খৎনা করত। সে একদিন নিশ্চিন্ত মনে তার দৈনন্দিন কাজে মক্কার গলিতে বের হয়েছে। পথে সে মনে মনে ভাবতে লাগল, এই গোলাম বাচ্চাসহ এখন দু'টি বালকের লালন-পালনের ভার তার উপর। আবার ভাবল, এই গোলাম বাচ্চা একদিন বড় হয়ে তার উপকার করবে। বিপদে-আপদে তার সাথী হবে। উম্মে আনমার ছিল খোযাআ বংশের মেয়ে। মক্কা শরীফের বনি জোহরার এক হলিফের সাথে বিবাহ হওয়ার সুবাদে সে মক্কায় থাকত। কুরাইশ বংশের সকল ঘরে ঘোরাফেরা করে সে নিজ ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। ঐ দিন সন্ধ্যায় সে ঘরে ফিরে দেখল, তার ছেলেরা খেলাধুলা করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি উভয়কে কিছু খাইয়ে শান্ত করল। পরে অতি কোমল ও স্নেহমাখা সুরে গোলাম ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা! তোমার নাম কি?

জবাবে ছেলে বললো, খাব্বাব।

উম্মে আনমার আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার পিতার নাম কি?

ছেলে জবাব দিল, আরিত। কিন্তু সে রি শব্দ ভালভাবে উচ্চারণ করতে পারল না।

উম্মে আনমার বললো, বাবা! আরবের কোন বংশে তোমার জন্ম।

বালক : আরবের কবিলা? আমিত ওসব কিছু জানি না।

উম্মে আনমার : তবে কি তুমি আজমী?

বালক : আজমী কি তাও আমি জানি না।

উম্মে আনমার : আচ্ছা বল দেখি, তোমার মায়ের নাম কি?

এ কথা শুনামাত্র বালক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বালকের কান্না দেখে বৃদ্ধা উম্মে আনমারের মন গলে গেল। সে বালককে আর কোন প্রশ্ন

না করে তার অশ্রুধারা মুছে সান্ত্বনা দিতে লাগল। সে কিছু শান্ত হওয়ার পর তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল এবং খাব্বাবের অবস্থা পরে সুযোগ মত জেনে নেওয়ার ইচ্ছা মনে চেপে রাখল।

পরদিনও উম্মে আনমার খাব্বাবের অবস্থা জানার চেষ্টা করল। আজও বালকের ঐ একই অবস্থা দেখে সে ক্ষান্ত হল। এ প্রসঙ্গ তুললেই খাব্বাব কেঁদে অস্থির হয়। উম্মে আনমার তাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেয়। পরে অনেক চেষ্টার পর সে বহু কষ্টে বালকের জন্ম-বৃত্তান্ত জেনে নিল। বনি আমের বংশের কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত খাব্বাব যে কবিলায় জন্মেছে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। তখন তার মা ও যুবতী বোন আছমার সামনেই দস্যুরা তার পিতাকে হত্যা করে ফেলে। তাদের সমস্ত সম্পদ লুট করে নেয়। পরে তাদেরকেও বন্দি করল। তার মাকে আরবের কোন এক কবিলার নিকট ও তার বোনকে অন্য এক কবিলার নিকট বিক্রি করে দিল। তারপর তাকেও দস্যুদের মালের সাথে মক্কায় নিয়ে এসেছে। মালপত্র সহজেই বিক্রি হয়ে গেছে, কিন্তু এ ছোট ছেলে খাব্বাব তার গলগ্রহ হয়ে পড়েছে। অবশেষে উম্মে আনমার তাকে খরিদ করে নেয়। এই হৃদয়বতী নারী খাব্বাবের সাথে গোলামের মত ব্যবহার না করে নিজ উদরের ছেলের মতই লালন-পালন করতে লাগল। খাব্বাব প্রকৃতপক্ষে উম্মে আনমারের খরিদা গোলাম– এ কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে তার ছেলে বলেই মনে করত। এখন সে বয়স্ক ও কর্মক্ষম হয়েছে।

তার মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, সে গোত্রের বিবেচনায় বনি জোহরার একজন হলিফ। তার বয়স আনুমানিক বিশ বছর হবে। সে এক কর্মকারের দোকানে কাজ শিখতে লাগল। পরবর্তীতে নিজেই একটা লৌহকারের দোকান খুলে রোজগার করতে আরম্ভ করল। খাব্বাব তার সমশ্রেণীর গোলাম ও খলিফদের মত যাদেরকে অন্য জায়গা থেকে মক্কায় আনা হয়েছে অথবা ঐ সকল দুর্দশাগ্রস্ত ছেলের মত যাদের পিতা-মাতা ভাগ্যক্রমে এখানে সন্তানসহ এসে গোলামে পরিণত হয়েছে। সে গোলামের মত মক্কায় লালিত-পালিত হলেও গোলামীর স্বাদ ও তিক্ততা কখনো তাকে উপলব্ধি করতে হয়নি। তবে আজাদীর পূর্ণ স্বাদও সে পায়নি। পূর্ণ গোলামও নয়, আবার পূর্ণ আজাদও নয়। তার কালাতিপাত হয়েছে এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায়।

খাব্বাব নয়ন মেলে দেখত যে, একদিকে মক্কার বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত সর্দারগণ ও তাদের বিলাসপ্রিয় ছেলে ও যুবকের দল আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত। অপরদিকে সহায়-সম্বলহীন দুর্বল, গরীব ও বৃদ্ধ, যুবকেরা গোলামী ও দারিদ্রের নিষ্পেষণে জর্জরিত। এই শোষিত যুবক দল অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করলেও শক্তি-সামর্থের অভাবে তা পূরণ করতে পারছে না। এরা বাহ্যত তাদের সর্দার-মনিবগণকে তাজিম করত বটে, কিন্তু অন্তরে তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসাভাব পোষণ করত। তারা ভাবত, সর্দার ও মনিব সম্প্রদায়ের যুবক দল অপেক্ষা জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতা ইত্যাদি কোন গুণেই তারা হেয় নয়। কিন্তু ধন-সম্পদ ও জনশক্তির অভাবে তারা গোলামীর শিকলে আবদ্ধ। যার ফলে তাদের অবস্থারও কোন প্রকার পরিবর্তন ও উন্নতি করতে পারছে না। মনিব সম্প্রদায়ের পদানত হয়ে জীবন-যাপন ও মৃত্যুবরণই যেন তাদের নিয়তির লিখন। তাদের জীবনে কোন প্রকার স্বচ্ছলতা সম্মান ও উন্নতির পথ উন্মুক্ত নয়। তারা যেন লাগামযুক্ত ঘোড়া। তারা কোথাও পরস্পর মিলিত হলে, নিজেদের এমন দুর্দশাগ্রস্ত জীবন সম্পর্কে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা করে। কিন্তু তাদের সব আলোচনা অনুতাপও হিংসানল হিসাবে অন্তরকে দগ্ধ করে, আর চোখের তপ্তাশ্রু সেই অনল প্রশমিত করে। মক্কার চারদিকের গ্রামাঞ্চলের বেদুঈন আরবদের প্রতি লক্ষ করে দেখল, তাদের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্যের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। গ্রাম্য আরবদের অবস্থা দেখে তারা বুঝতে পারে যে, তাদের ও তাদের মত দুর্বল লোকদের পক্ষে মক্কাতে থেকে কোন মতে দীন ও হীনভাবে জীবন-যাপন করাই শ্রেয়। কেননা মক্কা শরীফে শান্তি ও জানমালের নিরাপত্তা রয়েছে। অধিক কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত এখানে রুজি মিলে। তাছাড়া হজ করার জন্য চারদিক থেকে আরববাসীরা মক্কায় সমবেত হয়। আর এ জায়গার ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক দূর দেশের সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণে এ জায়গায় জীবন-যাপন করা খুব সহজ। স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি। তা সত্ত্বেও নিম্ন শ্রেণীর গোলাম সম্প্রদায়ের জীবনের উন্নতির সকল পথই রুদ্ধ। পক্ষান্তরে যারা ধন-সম্পদের অধিকারী, প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক তাদের জন্য উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সকল পথ উন্মুক্ত। তারা বাণিজ্য করার লক্ষ্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে প্রচুর ধনোপার্জন করে।

একদিন খাব্বাব তার এক বন্ধুর সাথে আলাপ করে বুঝতে পারল যে, বন্ধুর দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হয়ে আশার আলোকে তার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। সে বন্ধুকে বললো, বন্ধু! আজ তোমার মধ্যে নতুন ভাবের বিকাশ দেখছি, যা ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি। বল দেখি, ব্যাপার কি?

বন্ধু তাকে নিয়ম মাফিক জবাব না দিয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাল, যার অর্থ হচ্ছে এই– 'নিজ প্রভুর নামে পড়ুন, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন! পড়ুন! আপনার প্রভু অতি মহান, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ যা জানত না তিনি তা শিখিয়েছেন, কিন্তু মানুষ নিজের ধন-দৌলতের গর্বে নাফরমানি করে। নিশ্চয়ই সকলকে আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে'।

এই বাক্যগুলো শুনামাত্র খাব্বাবের শরীর শিহরিত হয়ে উঠল, পদযুগল কাঁপতে লাগল। সে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে তার বন্ধুকে পুনরায় বললো, তুমি যা পড়েছ তা আবার একটু পড়ে শুনাও। আমি ভাল করে তা উপলব্ধি করতে পারিনি।

খাব্বাবের অনুরোধে বন্ধু সেই আয়াত কয়েকবার তেলাওয়াত করে শোনাল। খাব্বাবও বিস্ময়াভিভূত হয়ে নিজেই শেষ তিনটি আয়াত কয়েকবার পড়ে বললো, এটা কার বাণী? নিশ্চয়ই তোমার নয়। কোথায় শুনেছ? আমি এমন কালাম শুনতে পারব?

বন্ধু বললো, নিশ্চয়ই পারবে। যদি শুনতে চাও, তবে আল আমীনের নিকট চল। এ সকল বাণী আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তিনি তা আমাদেরকে পড়ে শোনান।

অতঃপর খাব্বাব আল আমীন অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ঐ সকল আসমানী কালাম শুনে ইসলাম কবুল করে ধন্য হলেন।

একদিন প্রাতঃকালে আবু জাহেল হাসতে হাসতে মক্কার মসজিদে উপস্থিত হয়ে স্বীয় উরুতে চাপড় মেরে বললো, কুরাইশীগণ! তোমাদের ইচ্ছা হলে আমাদের ওখানে এক মনমুগ্ধকর তামাশা দেখতে যেও। শুন তোমরা, খাৎনাকারিণী উম্মে আনমারের পুত্র খাব্বাবও বেদীন হয়ে গেছে। কাল দুপুরে আমরা তাকে আগুনে পোড়াব।

বার.

মাসউদ বিন গাফেল হোযাইল বংশের হাজীদের সাথে মক্কাতে এসে আবদ বিন হারেস বিন যোহরা বিন কেলাবের ঘরে অতিথি হল। এটা তার শ্বশুরবাড়ি ছিল। হজ্জব্রত শেষ হওয়া পর্যন্ত সে তার নানাশ্বশুর ও শ্যালকদের ঘরে অবস্থান করল। নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় আবদ বিন হারেসকে বললো, দেখুন, আপনি আমাদের বনি হোযাইলের বস্তিতে গিয়েছেন, সে অনেক দিনের কথা। সেখানে আপনার মেয়ে ও নাতনি আছে। আপনার উপর তো তাদের কিছু হক নিশ্চয়ই আছে। সময় সুযোগে অবশ্যই একবার সে দিকে ঘুরে আসবেন।

আবদ বিন হারেস বললো, হ্যাঁ, তুমি সত্যই বলেছ। তোমাদের পাড়ায় আমি গিয়েছি অনেক দিন আগে। আমার মেয়ে ও নাতনীর হক আমার উপর অবশ্যই আছে। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও গোলযোগের কারণে আমাদের ও কায়েস গোত্রের সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও কুরাইশী লোকদের নজদের এলাকায় যেতে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

মাসউদ বললো, আপনি এ কী বলছেন? আপনার কুরাইশ বংশ হেরেম শরীফ ও বাইতুল্লাহর হিফাযতকারী। ভীত ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরা

আপনাদের এখানে এসে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। বাস্তুহারা ও পথভ্রষ্ট লোকেরা আপনাদের কাছে আশ্রয় নেয়। উৎপীড়িত ও নিপীড়িত লোকেরা আপনাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়। সুতরাং সারা দুনিয়া আপনাদের জন্য হেরেমের মত নিরাপদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আবদ বিন হারেস : হ্যাঁ, এমনিই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেখেছ তো কায়েস বংশের লোকেরা আমাদের এই এলাকায় এসে আমাদের সাথে সংগ্রাম করে। এই পবিত্র হেরেম ও বাইতুল্লাহর ইজ্জতের প্রতি তাদের কোন লক্ষ নেই। কায়েস বংশের ও তাদের হলিফগণের উৎপাত ও অপকর্ম থেকে কুরাইশগণকে কে রক্ষা করবে?

মাসউদ আবদ বিন হারেসের কথাগুলো মনোযোগের সাথে শুনে উত্তর দিল, বাহ্! আপনি এমন কথা বলছেন কেন? হোযাইল বংশে আপনার শ্বশুরবাড়ি। আবার আপনার মেয়ে ও নাতনীও আমাদের এখানে আছে।

আবদ বিন হারেস : তুমি আত্মীয়তার পরিচয় দিয়েছ এই জন্য শুকরিয়া। হোযাইলদের এলাকায় আমার বা অন্য কারো ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু তোমাদের ঐ এলাকা পর্যন্ত পৌঁছতে হলে কায়েস বা তদীয় হলিফদের কোন না কোন বস্তি পাড়ি দিতে হয়।

মাসউদ : বাহ! তাহলে আপনারা আমাদের হলিফ বনে যান। যতদূর পর্যন্ত হোযাইলদের প্রভাব বিস্তৃত আছে ততদূর পর্যন্ত আপনারা দুশমনদের হামলা থেকে নিরাপদ থাকবেন। আর যে সমস্ত এলাকা কুরাইশদের আশ্রিত, ঐ সমস্ত জায়গায় আমরা নিরাপদ থাকব।

আব্দ বিন হারেস : বেশ ভাল প্রস্তাবই বটে।

মাসউদ নিজ বাড়ির দিকে যাত্রা করল। তার নানা-শ্বশুর আব্দ বিন হারেসও সাথী হল। সেখানে গিয়ে আব্দ বিন হারেস প্রথমে তার মেয়ে হিন্দার ঘরে হাজির হল। হিন্দার স্বামী ইবনে আব্দ ওদ্দা তখন মারা গেছে। তারপর সে তার নাতি উম্মে আব্দ-এর (মাসুদের) ঘরে এল এবং তার নাতি নবজাত শিশু আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল।

হোযাইল বস্তিতে কিছুদিন অবস্থান করে আব্দ বিন হারেস মক্কায় নিজ

ঘরে ফিরে এল। এর কিছুদিন পর তার মৃত্যু হল। মাসুদের এ ছেলে মায়ের দিক দিয়ে কুরাইশী, পিতার দিক দিয়ে হোযাইলী। বাল্যকালে সে তার পিতৃভূমি হোযাইল বস্তিতে প্রতিপালিত হয়েছে। হোযাইল গোত্রের লোকেরা খুবই দরিদ্র। বালক ইবনে মাসউদ যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন তার পিতার ইন্তেকাল হল। হোযাইল বস্তিতে জীবিকার্জনের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় ইবনে মাসউদ মক্কাতে তার মাতুলদের আশ্রয়ে এল। এখানে সে খুব আদর-যত্নের মধ্য দিয়ে অনেক দিন কাটাল। মক্কার ধনাঢ্য আমীর ও বড় লোকদের যুবক ছেলেরা আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতায় গা ঢেলে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। এ অবস্থা দেখে ইবনে মাসউদ মনেপ্রাণে নিজের দারিদ্র ও দুর্বলতা উপলব্ধি করত। সে যখন উপার্জনক্ষম হল, তখন বুঝতে পারল, তার জীবনমান কুরাইশ ও তাদের হলিফগণের মধ্যবর্তী মানের ন্যায়। সুতরাং সে সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে জীবিকার্জন করতে শুরু করল। এতে সে কোন প্রকার সংকোচ অনুভব করে না। বরং সে তার মাতুলদের গলগ্রহ হয়ে থাকাকেই দোষণীয় ও অন্যায় মনে করল। সে রোজগারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। যেখানে যা সুযোগ পায় তা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় না। নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করার পর অবশেষে সে ওকবা বিন আবি মোয়াইতের বকরী চরানোকে পছন্দ করল। প্রতিদিন সকালে বকরীর পাল নিয়ে মক্কার বাইরে মাঠে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। এভাবে সুখ-শান্তিতে তার দিন কাটতে লাগল। কারো সাথে কোন প্রকারের ঝগড়া-বিবাদ নেই।

একদিন সে মাঠে মনিবের বকরী চরাচ্ছিল, এমন সময় দুই ব্যক্তি এসে কাছে দাঁড়ালেন। তাদের চেহারায় ভয় ও শংকার লক্ষণ ফুটে উঠল। মনে হল, তাদেরকে কোন শত্রু পেছন থেকে তাড়া করছে, আর তারা প্রাণের ভয়ে দ্রুতগতিতে আত্মরক্ষার জন্য কোন দিকে চলে যাচ্ছে। যুবক আবদুল্লাহ বিন মাসউদ চুপচাপ তাদের প্রতি লক্ষ করল। কতক্ষণ পর আগন্তুকদের একজন যুবককে বললো, বাবা তোমার কাছে দুধ আছে কি? আমাদেরকে কিছু দুধ পান করাও, আমরা খুবই পিপাসার্ত।

যুবক বললো, আমি আপনাদেরকে দুধ পান করাতে অক্ষম। কারণ এ বকরীগুলো আমার নয়। আমার হলে আমি আপনাদের দুধ পান করাতে কার্পণ্য করতাম না।

দ্বিতীয়জন তার সাথীকে বললো, বালক ঠিকই বলেছে। সততার প্রতি তার পূর্ণ দৃষ্টি আছে। তারপর প্রশান্ত দৃষ্টিতে যুবকের প্রতি তাকিয়ে বললেন– বাবা, তোমার কাছে এমন বকরী আছে কি, যার এখনো বাচ্চা হয়নি।

যুবক বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। হুজুর আদেশ করলে সে রকম একটা এনে দিতে পারি। এই বলে যুবক কাছাকাছি থেকে ঐ ধরনের একটা বকরি নিয়ে এল।

ঐ প্রশান্ত দৃষ্টিসম্পন্ন আগন্তুক বকরিটাকে নিজের পায়ে চাপ দিয়ে ধরে দোহন করতে শুরু করলেন। তিনি বকরীর স্তনে হাত ফিরিয়ে কতগুলো দুআ উচ্চারণ করলেন। যুবক তা শুনতে পেল ঠিকই, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। যুবক দেখল বকরীর স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট একটি পাথরের বাটি ছিল। তিনি ঐ বাটি ভরে বকরীর দুধ দোহন করলেন এবং উভয়ে তৃপ্তিসহকারে পান করলেন, যুবককেও পান করালেন। তারপর বকরীর স্তনের দিকে চেয়ে বললেন, শুকিয়ে যা! বকরীর স্তন তখনি শুকিয়ে আগের মতো হয়ে গেল।

এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে যুবক আবদুল্লাহ বিন মাসউদ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখ থেকে কোন কথা বের হল না। সে এই দুই ব্যক্তিকে আগে কখনো দেখেনি। তারাও এ যুবককে কখনো দেখেনি। তারপর তারা যুবককে কিছু না বলে নিজেদের গন্তব্য পথে চলে গেল। যুবকের চেতনা ফিরে এল। সে দেখল বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সূর্যাস্ত যাবে যাবে। যুবক তার বকরীর পাল নিয়ে মক্কায় ফিরে এল।

তার মনে দিনের এ অভাবনীয় ঘটনা খুব তুলপাড় করতে লাগল। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারল না। বকরীগুলো খেয়াড়ে আবদ্ধ করে যুবক অস্থির মনে তার মনিব ওকবা বিন আবি মোয়াইতকে তালাশ করে ফিরল। দেখল সে নিজ পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবসহ ঘরেই আছে। যুবক তার কাছে গিয়ে বললো, আবু অলিদ (ওকবার ডাকনাম)! আমি আপনার চাকরি ত্যাগ করলাম। কাল থেকে আপনি অন্য রাখাল নিযুক্ত করে আপনার বকরী চারানোর ব্যবস্থা করুন।

ওকবা বললো, হোযাইলী যুবক! কী হয়েছে? এই বকরীগুলো দ্বারা অথবা আমার দ্বারা তোমার কোন প্রকার কষ্ট হয়েছে কি?

যুবক বললো, না কোন কষ্ট হয়নি। আমি নিজ ইচ্ছায় বকরী চরানোর কাজ ছেড়ে দিলাম।

যুবক কোন প্রতিউত্তর না শুনেই চলে গেল। পরদিন সে যে স্থানে ওকবার বকরী চরাতো, সেখানে গিয়ে ঐ আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের বিষয় ধ্যান করতে লাগল। গতকাল তাদের যে অভূতপূর্ব ঘটনা দেখেছে, তাই উদ্ভ্রান্ত মনে ভাবতে লাগল। যে মন্ত্র পড়ে আগন্তুক বকরীর দুধ দোহন করেছিলেন, তা স্মরণ করার জন্য অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই তা স্মরণ হল না। ইতোপূর্বে এ যুবক এতই স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিল যে, যখন যা শুনত তা তার অন্তরে অংকিত হয়ে যেত। কিন্তু আগন্তুকের ঐ মন্ত্রগুলো অন্য ধরনের ছিল।

যুবক এ সকল বিষয় ভাবতে ভাবতে মনে মনে বললো, ঐ প্রশান্ত বদন আগন্তুক ব্যক্তি ও তার সহচরের এ পথে আগমন, তাদের কথাবার্তা ও মন্ত্র পাঠের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। যুবক চারদিকে ঘোরাফেরা করে প্রথমে তার অন্তরপটে, পরে যেন তার চোখের সামনে ঐ মহাপুরুষের চিত্র দেখতে পেল। যিনি গতকাল বাচ্চাবিহীন বকরীর দুধ দোহন করেছিলেন, তিনি যেন বকরীর ওলানে হাত বুলিয়ে দুআ পাঠ করছেন। যুবক তা শুনে ইয়াদ করার চেষ্টা করেও স্মরণ রাখতে পারছে না।

সমস্ত ঘটনা তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সন্ধ্যা সময় ঐ স্থান থেকে ফিরে মক্কায় প্রবেশ করল না। সে যেন উদ্ভ্রান্ত খেয়ালে বিভোর হয়ে মক্কার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এতে তার কোন ধরনের ক্লান্তি ও ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট অনুভূত হল না। আগন্তুক যে দুধ পান করিয়েছিল তার স্বাদ যেন ঠোঁটে এখনো লেগে আছে। তার প্রশান্তদৃষ্টি ও উজ্জ্বলবদন তার নয়নপটে প্রতিভাত হচ্ছে। তার সুমধুর বাণী কানে মধুবর্ষণ করছে। যুবক সারা রাত না ঘুমিয়ে এভাবে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিল।

পরদিন সূর্যোদয়ের পর মক্কায় এল, কিন্তু তখনো তার মনে শান্তি নেই। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর সে ঐ মহাপুরুষের ও তার সহচরের সন্ধান পেল। সে জানতে পারল যে, ঐ মহাপুরুষ হলেন খোদ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে কালবিলম্ব না করে হযরতের দরবারে উপস্থিত হল। হুজুরের সম্মুখে গিয়ে কম্পিতকণ্ঠে মৃদুস্বরে বললো, হুজুর!

আপনি আমাকে ঐ মন্ত্রগুলি শিখিয়ে দিন, যা আমি গতকাল বকরী দোহনকালে আপনার পবিত্র যবানে শুনেছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যবদনে স্নেহের সাথে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই শিক্ষিত ছেলে! তাছাড়া যুবকের অন্তরে এ খেয়াল ও ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, সে নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের খেদমতের জন্য অথবা ওকবা বিন আবু মুয়াইতের বকরী চরানোর জন্যে পয়দা হয়নি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে থেকে তার অমূল্য বাণী শ্রবণ ও মুখস্থ করে তা প্রচার করাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ দুর্বল ও হাল্কা পাতলা। আকৃতিতে ছোটখাট কিন্তু খুবই ফুর্তিবাজ ও চৌকস লোক ছিলেন। তিনি কিছুদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংশ্রবে থেকে শিক্ষালাভ করে মক্কার অলিতে-গলিতে হযরতের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। কুরাইশরা তাতে প্রমাদ গোনল। কোন জায়গায় হযরতের বাণী প্রচার করতে দেখে কুরাইশগণ সেখানে উপস্থিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ অন্যত্র চলে যেতেন। তার কোন পাত্তাই মেলত না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সহচরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে যারা পেছনে লেগেছিল, তারা মক্কার প্রায় সর্বত্র তাকে প্রচার কাজ চালাতে দেখত। কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারত না। অবশেষে আবু জাহেল বিরক্ত হয়ে একদিন কুরাইশদের মজলিসে বললো, এ হোযাইলী যুবক আবদুল্লাহ বিন মাসুদের ন্যায় মুহাম্মদের অন্য কোন সহচর আমাকে এত উত্যক্ত করতে পারেনি। সে সবখানে মুহাম্মদের বাণী প্রচার করে লোকদের ধারণা পরিবর্তন ও বিষাক্ত করে চলছে। তাকে কোন মতেই কাবু করতে পারছি না। সুযোগ পেলেই আমি তাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।

ওকবা বিন আবি রাবিয়া বললো, আবুল হাকাম! নম্রভাবে সহজে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা কর। এ হোযাইলী যুবকের গায়ে হাত তুলো না। কারণ হোযাইলদের হলিফ বনি যোহরা গোত্র কখনো তাকে তোমার হাওলা করবে না। তুমি যদি তার গায়ে হাত উঠাও তবে সমস্ত হোযাইল বংশ কুরাইশদের উপর ক্ষেপে যাবে এবং আমাদের বাণিজ্য পথ রুদ্ধ হয়ে

যাবে। বাণিজ্যের নিরাপত্তাই কুরাইশদের একমাত্র অভিশপ্ত জিনিস।

আবু জাহেল বললো, ভাল কথা, তবুও সুযোগ পেলে তাকে কিছু না কিছু শাস্তি দিতেই হবে।

কিন্তু আবু জাহেল কখনো সে সুযোগ পায়নি। মাত্র একবার যখন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে আবিসিনিয়াতে হিজরত করার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন আবু জাহেল মক্কার মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল, এক দুর্বল ও ক্ষীণদেহের ব্যক্তির চারপাশে অনেক লোকের ভিড়। লোকটা কিছু বয়ান করছে। আর শ্রোতারা তা ধীর ও শান্তভাবে শ্রবণ করছে। আবু জাহেল চুপিসারে দেয়ালের আড়ালে এসে এভাবে দাঁড়াল, যেন জনগণ তাকে দেখতে না পায় আর সে যেন তাদেরকে দেখতে পায়। সে তখন বক্তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনতে লাগল। বক্তা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ অতি মধুর স্বরে কুরআনুল কারীমের সূরা ফুরকানের কিছু আয়াত পড়ে জনগণকে শোনাচ্ছে। তার অর্থ এই– আল্লাহর বান্দা ঐ সকল লোক, যারা জমিনে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে এবং মূর্খ লোকেরা তাদের সাথে মূর্খোচিত কাথাবার্তা বললে তারা মূর্খদেরকে সালাম বলে, প্রতিউত্তর করে না। যারা স্বীয় প্রভুর সম্মুখে সিজদা করে, আদবের সাথে দাঁড়িয়ে রাত কাটায়। আর যারা খোদার দরবারে এমন প্রার্থনা করে– হে প্রভু! আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন। দোযখের আযাব খুবই ভয়ংকর ও কষ্টদায়ক। দোযখ বর্ণনাতীত দুঃখ-কষ্টের জায়গা। তারা অপব্যয় করে না। কৃপণতাও করে না। বিবেচনার সাথে ব্যয় করে। তারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না, তারা কারো প্রতি অবিচার করে না। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না। তারা ব্যভিচার করে না। যারা এমন মন্দকাজ করবে তারা কঠিন গুনাহের কাজ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের দ্বিগুণ শাস্তি হবে এবং অপমান ও অপদস্ততার মাধ্যে অনন্ত কাল থাকবে। কিন্তু যারা তওবা করে ঈমান এনে সৎকাজ করবে, আল্লাহ তাআলা পরম দাতা ও দয়ালু। যে ব্যক্তি তওবা করে সে নিশ্চয়ই আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। যখনই তারা কোন অহেতুক কাজের সম্মুখীন হয়, তখনি সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

আবু জাহেল এই কালাম শুনে ঘাবড়ে গেল। তার শরীর কাঁপতে লাগল। সে যদি তখন নিজেকে আপন অবস্থার উপর ছেড়ে দিত, তবে নিশ্চয়ই তার মুখে ঐ শব্দমালা উচ্চারিত হত, যা অন্য শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে বলছে- আহ্! আমরা আল্লাহর ঐরূপ বান্দার দলভুক্ত হতে চাই।

কিন্তু আবু জাহেল নিজ ফিতরাতের উপর থাকল না। বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীতে উত্তেজিত হয়ে সে শিকারী পাখির মত জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কর্কশস্বরে চিৎকার করে বললো, কমবখ্ত! তোদের উপর অভিশাপ! আমি আজকের মত স্পর্ধা কখনো দেখিনি। তোমরা এ পথভ্রষ্ট লোকের পাশে সমবেত হয়ে এমন সব কথা শুনছ, যা দ্বারা দেশে নানা প্রকার ফেতনা-ফ্যাসাদ ও গোলাযোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ কুরাইশদের মজলিস তোমাদের কাছে রয়েছে। তোমরা সেখানে যাও না কেন?

এ ভীষণ-দর্শন লোকের কর্কশ আওয়াজ শুনামাত্র জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকল। আবু জাহেল তার কাছে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, ইবনে উম্মে আব্দ! বড়ই আফসোসের কথা, তুমি আমাদের হলিফ ও গোলামদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে এ যাবৎ উস্কিয়ে আসছ। মনে হয় তুমি আমার হাতে মার না খেয়ে এ কাজ থেকে বিরত হবে না।

ইবনে মাসউদ তার কথার জবাব দিতে চাইলে আবু জাহেল তীর ধনুক দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিল। ইবনে মাসউদ বেপরোয়া হয়ে ক্ষিপ্রতার সাথে আবু জাহেলকে পাল্টা আক্রমণ করল। তিনি এক হাতে আবু জাহেলের বুকে ধাক্কা দিয়ে অপর হাতে তার মুখে সজোরে চপেটাঘাত করে বললেন, আমি হোযাইল বংশের যুবক!

আবু জাহেল ক্রোধে ও অপমানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ইবনে মাসউদ ধীরে ধীরে সরে পড়লেন। আবু জাহেল প্রকৃতিস্থ হয়ে ইবনে মাসউদকে চিৎকার করে বললো, রাখাল বালক! তোর রক্ষা নেই।

প্রত্যুত্তরে ইবনে মাসউদ বললেন, আল্লাহর দুশমন! তোমারও রক্ষা নেই।

তারপর উভয়েই নিজ নিজ পথে চলে গেল। ইবনে মাসউদ চোখের পানি ফেলতে ফেলতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের

নিকট হাজির হয়ে বললেন, আজ থেকে মক্কাতে আর আমার আশ্রয় নেই। কেননা আজ আমি আবু জাহেলের মুখে চপেটাঘাত করেছি। আমাকে এখন হিজরত করতে হবে। খোদার কসম! আমি হিজরত করতে একই সাথে খুশি ও নারাজ দুই-ই আছি। খুশি এজন্য যে, এতে সওয়াব ও গুনাহ মাফ আছে। নারাজ এজন্য যে, এক অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে।

এদিকে আবু জাহেল নিজ বংশের মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হল। লজ্জা ও অপমানের ভাব অন্তরে গোপন রেখে ক্রোধ ও উত্তেজিত সুরে বললো, বনি মাখযুমের লোকেরা! তোমাদেরকে ধিক্। তোমরা যদি আপন ইজ্জত বজায় রাখতে চাও, তবে ইবনে মাসউদ থেকে আমার প্রতিশোধ তোমাদেরকে নিতেই হবে। সে আমার সাথে এমন অপরাধ করেছে যে, তার রক্ত দিয়ে না ধুলে তা মুছা যাবে না।

মাখযুমেরা তখনি মক্কাতে ও মক্কার চারপাশে ইবনে মাসুদের তালাশে লেগে গেল। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। আবু জাহেল নিজে বদরের যুদ্ধে তার প্রতিদ্বন্দ্বির সাক্ষাত পেয়েছিল।

তের.

মদীনার জনৈক ইয়াহুদী ব্যবসায়ী সাল্লাম বিন হোবির কোরেজি অন্যান্য বছরের মত এবারও শামদেশ থেকে অনেক পণ্যসামগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছে। তার পণ্যের মধ্যে নানা প্রকার জিনিস রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু সেখানকার কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য। কিছু এমন শিল্পজাত দ্রব্য আছে, যা রুম দেশের লোকেরা বসরা ও দামেস্কে রপ্তানি করে এবং তাদের অধীনস্থ আরব ও ইহুদী ব্যবসায়ীদেরকে রুম সাম্রাজ্যের বাইরে দূর দেশে বিক্রি করার জন্য দিয়ে থাকে। সাল্লাম দীর্ঘ সফরের পর ক্লান্তি দূর করার জন্যে নিজ বাড়িতে বনি কোবরা গোত্রে অবস্থান করার পর ঐ সমস্ত পণ্যসামগ্রী ইয়াছরেব লোকদেরকে দেখাতে বসল। বিভন্ন গোত্রের লোকেরা আউস খযরাজ প্রভৃতি চারপাশের ইহুদীরা এসে তার মালপত্র পছন্দমত ক্রয় করতে লাগল।

অল্প দিনের মধ্যে সাল্লাম তার সমস্ত পণ্য বিক্রি করে খুব লাভবান হল। কিন্তু একটি শিশু গোলাম তার পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়াল। একে কিছুতেই বেচা যায় না। সাল্লাম একে আরব ইহুদী সকল শ্রেণীর খরিদ্দারের কাছে বিক্রি করতে চেয়ে ব্যর্থ হল। সে সাল্লামের গলায় বিষকাঁটার মত আটকে থাকল। সাল্লাম এ গোলামকে বসরার এক কলবী

তাজের থেকে নামমাত্র দামে খরিদ করেছিল। সে মনে করেছিল, ইয়াছরেবের কেউ না কেউ একে দ্বিগুণ বা তিনগুণ মূল্যে খরিদ করবে। কিন্তু ঘটনা ঘটল এর উল্টো। কারণ হচ্ছে এই যে, ইয়াছরেববাসী সাল্লামকে কখনো গোলাম বেচাকেনা করতে দেখেনি। তারপরও সে একে বিক্রি করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। যে কারণে জনগণের মনে নানা ধরনের সন্দেহের জন্ম হয়েছে। কেউ বললো, সাল্লাম একে নিজের জন্য খরিদ করেছিল, এখন এর মধ্যে ত্রুটি দেখে বেচার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এ শিশু গোলামকে রোগাক্রান্ত বলে মনে হয়। তার মনিবদের হাতে অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। সে ভালভাবে আরবীও বলতে পারে না। রুমি ভাষাও তেমন জানে না। কারো সাথে কথা বলতে হলে কোন মতে ফার্সি ভাষায় বলে, যা কিনা কেউ বুঝে না।

সাল্লাম লোকদেরকে বলতে লাগল, একে দেখতে রোগগ্রস্ত মনে হলেও ভাল খানাপিনা পেলে এ গোলামের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাবে। তার দুর্বলতাও দূর হয়ে যাবে। তখন সে একজন চৌকস ও কর্মঠ গোলামে পরিণত হবে। সে আরো বললো, এ ছেলে পারস্যের এক অতি উঁচু ভদ্র পরিবারের। ঐ পরিবার ইস্তেখার থেকে উবুল্লাতে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সেখানে তারা অনেক জায়গা-জমি খরিদ করে হাবশী নবতীদের দ্বারা বর্গা পদ্ধতিতে চাষাবাদ করত। এছাড়া তারা ব্যবসা-বাণিজ্যও করত।

এ গোলামের বংশ পরিচয় সম্পর্কে সাল্লামকে বিস্তারিত কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে এতদূর বলে ক্ষান্ত হত, যে ব্যক্তি একে আমার কাছে বিক্রি করেছে সে বলেছে, আরবেজ রুমীদের সাথে মিলিত হয়ে যখন উবুল্লা প্রদেশ আক্রমণ করেছিল, তখন এ বাচ্চাকে বন্দি করে নিয়ে কলবীদের নিকট বিক্রি করেছে। লোকেরা এ লেকচার শুনে বলত, তবে তুমি একে নিজেই রাখ না কেন?

সে বলত, এর চেয়ে একে আমি যে দামে খরিদ করেছি তা-ই আমার বেশি প্রয়োজন। বিশেষত সে এখন উপার্জনক্ষম হয়নি। এখন একে রেখে আমি কী করব? কিন্তু এটাও ঠিক যে, এ ছেলে ভাল খাবার-দাবার পেলে অচিরেই তার স্বাস্থ্য ফিরে আসবে এবং অদূর ভবিষ্যতে সে একজন

হুশিয়ার কারিগর ও কর্মঠ গোলাম হবে। সে অনুসন্ধান ছাড়াই তার অবস্থা সঠিক বুঝতে পারে।

লোকেরা সাল্লামের মুখে এর ভূয়সী প্রশংসা শুনে চলে যায়। এভাবে সাল্লাম সর্বদা মদীনার বাজারে এই বাচ্চাকে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যায়। একদিন কবিলা আওজ বংশের ছোবাইতা বিনতে ইয়ার নামক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় বাচ্চাটাকে দেখে তার মনে দয়ার সঞ্চার হল। সে তাকে খরিদ করতে অগ্রসর হয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করল।

সাল্লাম বললো, বনি কলবের যে ব্যক্তি একে আমার কাছে বিক্রি করেছে সে এর নাম সালেম বলেছে।

ছোবাইতা পুনরায় তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরে সাল্লাম বললো, তা আমার জানা নেই। আমি মাফেল নামক এক কলবী তাজের থেকে একে খরিদ করেছি। সে বলেছে, এই ছেলে খুবই উঁচু ও সম্ভ্রান্ত বংশের। ইস্তাখার থেকে এসেছে।

ছোবাইতা বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ বংশ ইস্তাখার থেকে উবাল্লাতে এসে বসতি স্থাপন করে নিবতী বংশের লোক দ্বারা কৃষিকাজ করাতো। ইরাকের সব জায়গায় এদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। তা আমার জানা আছে। আমি এ ছেলেকে খরিদ করতে চাই। মূল্য কত চান বলুন?

সাল্লাম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললো, আমি শুধু এর ক্রয় মূল্য ও এ যাবত এর পিছনে যা ব্যয় করেছি তাই চাই, এর বেশি কিছু চাই না।

অতঃপর দাম-দস্তুরমূলক কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর ছোবাইতা ঐ গোলাম বালকটাকে কিনে বাড়িতে নিয়ে গেল। এই বেচা-কেনাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই নিজেকে লাভবান মনে করল। ছোবাইতা একে কোন প্রকারের আয়ের জন্য খরিদ করেনি। তার উদ্দেশ্য একমাত্র বালকের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তার উপকার করা। এটাই তার লাভ।

বালককে বাড়িতে নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে ছোবাইতা মনে মনে বললো, এমন মানব জীবনের প্রতি আল্লাহর লা'নত, যারা একে অন্যের প্রতি রহম করে না, সবল দুর্বলকে দয়া করে না। কোন মায়ের সন্তান অপহৃত হলে তার জন্য কারো মন দয়ায় বিগলিত হয় না। যদি আমার সন্ত

ান ডাকাতেরা কেড়ে নিয়ে কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যেতো! তাহলে আমার কী অবস্থা হতো! আমি কিভাবে এ বিচ্ছেদ বেদনা বরদাশ্‌ত করতাম! শয়নে-স্বপনে সর্বাবস্থায় তার জন্য কেঁদে মরতাম। আমার জীবন ধারণ কষ্টকর হতো। এমন ভাবতে ভাবতে তার মনে হলো, যেন তার মাকে চোখের সামনে বিরহ-বেদনা ক্লিষ্ট অবস্থায় দেখছে। ডাকাতেরা যখন এই বাচ্চাকে তার মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিলো, তখন মায়ের অবস্থা যেমন হয়েছিলো তা যেন সে স্বচক্ষে দেখছে। এই বালক পারস্যরাজ কেসরার দেশ থেকে অপহৃত হয়েছে। কেসরার সৈন্যদল একে রক্ষা করতে পারেনি। ইয়াছরেবে এমন ঘটনা ঘটলে সে কিভাবে একে রক্ষা করবে? এখানে ইহুদি ও বেদুইন আরবেরা অতি সাধারণ বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে তলোয়ার চালায় ও লুটতরাজ করে। এ সকল চিন্তাও তার মনে উদয় হতে লাগলো।

ছোবাইতা নিজ বাড়িতে পৌঁছে বিশ্রামান্তে বালক সালেমকে খুবই মায়া-মমতা ও যত্নসহকারে খানাপিনা করাল। সে আবার ভাবতে লাগলো, যদি সে বিবাহিতা হয়ে পুত্রবতী হয়, আর সে পুত্রের এ অবস্থা হয়, তবে তার কী অবস্থা হবে? সে তার বিচ্ছেদ বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করতে থাকবে। ঠিক তেমনি এই বালকের ফারসি মা ও দুর্দশাগ্রস্ত অন্য মায়েরা অশ্রুজলে বুক ভাসাচ্ছে।

ছোবাইতা সযত্নে বালককে লালন-পালন করতে লাগলো। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ছোবাইতার যত্নের পরশে এ বালক বেশ সুদর্শন ও চালাক-চতুর হয়ে উঠলো। কিছুদিন পর আওজ ও খাযরাজ বংশের বহু ভদ্র পরিবার এবং চারদিকের উচ্চ বেদুঈন আরব বংশ থেকে ছোবাইতার বিবাহের প্রস্তাব আসতে লাগলো। কিন্তু সে কোনো প্রস্তাবই কবুল করলো না। কুরাইশ বংশের এক ব্যবসায়ী কাফেলা শাম থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ইয়াছরেবে এসে কিছুদিন অবস্থান করলো।

এ কাফেলাতে আবু হোযাইফা হোসেন বিন উতবাও ছিলো। সে ছোবাইতা ও তার গোলাম সালেমের অনেক প্রশংসার কথা শুনতে পেয়ে তাদের বিস্ত ারিত অবস্থা জানার জন্য ছোবাইতার বস্তিতে এসে অনেক খোঁজ-খবর নিলো। লোকমুখে ছোবাইতার ভূয়সী প্রশংসা শুনে তার প্রতি আসক্ত হয়ে

তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালো। ছোবাইতা এ প্রস্তাবও প্রথমে উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু শেষে আবু হোযাইফার বংশমর্যাদা ও সুখ্যাতির বিষয় জানতে পেরে আগ্রহী হলো। সে আরো জানতে পারলো যে, কুরাইশরা পবিত্র বাইতুল্লাহর হিফাজতকারী। যাকে রক্ষা করার জন্য খোদ আল্লাহ তাআলা পাখির ঝাঁক পাঠিয়ে তার উপর আক্রমণকারী আসহাবে ফিল আবরাহাকে তার সৈন্যদলসহ সমূলে ধ্বংস করেছে। অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ কুরাইশ বংশের জনৈক সরদার আবু হোযাইফার সাথে বিবাহের পয়গাম কবুল করে কৃতার্থ হলো।

বিবাহের পর আবু হোযাইফা, ছোবাইতা ও তার গোলাম সালেমকে নিয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে মক্কায় চলে আসলো। বাড়িতে এসে সে যেন চারদিকের পরিবেশে একটা পরির্বতন অনুভব করতে পারলো। পরদিন সকালে ও বিকালে সে হেরেমের মসজিদে কুরাইশদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে দেখলো, সেখানে এক নতুন বিষয়ের আলাপ-আলোচনা চলছে। পূর্বের ন্যায় এ সকল আলাপ-আলোচনাতে তার মনে শান্তি এলো না। তার মনে হলো, মক্কাতে নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে। যার কারণে এই সকল মজলিসে আগের মত লোক সমাবেশ নেই। কেমন যেন বিপ্লবের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। সে তার বিশেষ বন্ধু উসমান বিন আফফান উমবী, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ প্রমুখ কোথায় জিজ্ঞাসা করে কারো নিকট কোন সদুত্তর পেলো না। অনেকে তো কোনো উত্তরই দিলো না। আর কেউ ইশারা-ইঙ্গিতে এমন অস্পষ্ট উত্তর দিলো যা সে বুঝতে পারলো না।

আবু হোযাইফা এমন হাব-ভাব দেখে চিন্তিত হয়ে মনে মনে বললো, বন্ধু-বান্ধবেরা তো মক্কাতেই আছেন। বাইরে যাননি। অন্যের নিকট থেকে তাদের খোঁজ-খবর না নিয়ে নিজে তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা-সাক্ষাত করাই ভালো হবে। এ ভাবনার পর সে একদিন উসমান বিন আফফানের বাড়িতে গেলো। উভয় বন্ধুর বয়সে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও তাদের বন্ধুত্ব পুরাতন ও গাঢ় ছিলো।

আবু হোযাইফা উসমানের বাড়ির অন্দরমহলে পৌঁছলে উসমান খুবই নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

আবু হোযাইফা বললো, আমি বিদেশ থেকে আসার পর হতেই তোমাকে

কুরাইশদের মজলিসে তালাশ করে পাচ্ছি না। তুমি সেখানে যাও না কেন?

জবাবে উসমান বললো, ঐসব মজলিস আমার পছন্দ হয় না। তাদের আলাপ-আলোচনাও আমার ভালো লাগে না।

আবু হোযাইফা : তবে কি তারা তোমাকে কোন প্রকার কষ্ট দিয়েছে?

উসমান কোনো জবাব দিলো না। আবু হোযাইফা আবারো সেই প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পেলো না। অবশেষে সে নিজেই বললো, উসমান! অবশ্যই কোনো একটা কিছু ঘটেছে। আমি লাত-ওজ্জার শপথ করে বলছি...!

তার এ শপথবাণী শুনে উসমানের চেহারা বিকৃত ও কপাল কুঞ্চিত হলো।

আবু হোযাইফা বললো, দেখ উসমান, আমাদের পরম বন্ধুত্বের খাতিরে হলেও তুমি আমাকে তোমার মনের কথা খুলে বলো।

উসমান শান্ত ও মৃদুস্বরে বললো, আচ্ছা আমাদের বন্ধুত্ব যদি তুমি বর্তমান রাখতে চাও তবে লাত-উজ্জা ইত্যাদি দেবতার নাম নিও না। এরা তোমার কোনো উপকার করতে পারে না।

এ কথা শুনে আবু হোযাইফা কতক্ষণ নীরব থেকে বললো, উসমান! মনে হয় তুমি বেদীন হয়ে গেছো!

উসমান নম্রভাবে উত্তর দিলেন, না আবু হোযাইফা, বেদীন হইনি। আমি সৎপথ পেয়েছি। তুমি একজন বুদ্ধিমান ও নীতিবান যুবক। দেশ-বিদেশে সফর করে মানুষের অবস্থান জেনেছো। জামানার পরিবর্তন, উত্থান-পতন ও সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট লাভ করেছো। বলো দেখি, আমার মতো লোক ও তোমার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি এই কাঠের ও পাথরের মূর্তি যা আমাদের নিজ হাতে তৈরি– কেমন করে পূজা করতে পারে?

আবু হোযাইফা চিন্তা করে বললো, উসমান! তুমি তো সত্য কথাই বলেছো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমি তো এতকাল এ সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই করিনি। পূর্বপুরুষদের রীতি অনুযায়ী বংশের লোকদের দেখাদেখি মূর্তিপূজা করে আসছি।

উসমান : আচ্ছা, এখন তো হেদায়াতের রাস্তা খুলে গেলো, তবে কী করবে?

আবু হোযাইফা : নিশ্চয়ই হোদায়েত গ্রহণ করতে হবে। আচ্ছা বল, আমাকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কখন নিয়ে যাবে?

উসমান : ইচ্ছে হলে এখনি চলো।

ঐ দিনই আবু হোযাইফা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলো এবং তার স্ত্রী ছোবাইতাও সাথে সাথে ঈমান আনলো। তার গোলাম সালেমও মনিব দম্পতির কথাবার্তা শুনে তাদের মতো ঈমান এনে মুসলমান হলো। সেদিন মক্কাতে মুসলমানের আর এক পরিবার বাড়লো।

কিছুদিন পর ছোবাইতা শুনতে পেলো যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামদেরকে আজাদ করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন এবং যারা আজাদ করে দিবে তাদের জন্য আল্লাহর অশেষ রহমত ও গুনাহ মাফের সুসংবাদ দিচ্ছেন। একথা শুনে ছোবাইতা তার পার্শিয়ান গোলাম সালেমকে ডেকে বললো, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আজাদ করে দিলাম। তুমি যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যেতে পারো। আর যাকে খুশি তোমার অভিভাবক বানাতে পার।

সালেম আবু হোযাইফাকে বললো, আপনি আমার অলী হবেন।

আবু হোযাইফা বললেন, না, আজ হতে তুমি আমার পুত্র।

চৌদ্দ.

আবদুল্লাহ বিন সোহাইল বিন আমর তার ভগ্নিপতি আবু হোযাইফা বিন উৎবা বিন রাবিয়ার বাড়িতে এসে তার ভগ্নি সাহ্‌লা বিনতে সোহাইলের সাথে সাক্ষাৎ করলো। সাহলা অতি আগ্রহের সাথে তার ভাইকে সংবর্ধনা জানাল। আবদুল্লাহ বোনের আদর-যত্ন দেখে অত্যন্ত খুশি হলো এবং ভগ্নির সন্তুষ্টির জন্য নিজ দেশ ও বংশের (কুরাইশের) কাহিনী ও অবস্থা শুনাতে লাগলো। আবদুল্লাহ খুবই বাকপটু লোক ছিলো। কুরাইশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আগ্রহের সাথে তার কথা শুনতো। সাহলাও খুশিমনে ভাইয়ের কথা শুনতে লাগলো। আবদুল্লাহ চাইলো তার বোনও তাতে অংশগ্রহণ করে তাদের বাল্যজীবনের ইতিহাস বর্ণনা করে উভয়েই আনন্দ উপভোগ করুক। কিন্তু বোন নীরব থেকে ভাইকে বলতে অনুরোধ করলো।

কথাবার্তার মধ্যে আবদুল্লাহ অনুভব করলো তার বোন অন্যমনস্কা। ভাইয়ের কথায় কৃত্রিম হাসি হেসে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে শুধু। এটা বুঝতে পেরেও আবদুল্লাহ ধীরস্থিরভাবে তার সাথে কথাবার্তা চালিয়ে গেলো। দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনার পর আবদুল্লাহ বিদায় গ্রহণ করতে উদ্যত হলে তার বোনও বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্যে বাড়ির আঙ্গিনায় এলো।

আবদুল্লাহ বোনকে বিদায় আলিঙ্গন করতে চাইলে বোন যেন ভীত হয়ে পিছু হটলো। আবদুল্লাহ বিস্মিত হয়ে বোনের প্রতি তাকিয়ে থাকলো। পরে

আবার তার ঘরে এসে বসলো। কিছুক্ষণ পর আবদুল্লাহ বললো, সাহ্‌লা! আজ তোমার অবস্থা যেন কেমন বিস্ময়কর মনে হচ্ছে! তোমরা কি আগামী দিন এখান থেকে হিজরত করতে ইচ্ছা করো?

সাহ্‌লা ভীতা ও শংকিতা হয়ে বললো, কেমন হিজরত, কোন হিজরত?

একথা শুনে আবদুল্লাহ খিলখিল করে হেসে বললো, আমি এমন আলাভোলা মেয়ে তো আর কখনো দেখিনি! যে নিজ ভাইয়ের সাথে প্রতারণা করতে চায়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহচরেরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করছে, একথা কারো অজানা নয়। সকলেই এ বিষয়ে আলোচনা করছে। কুরাইশরা চাইলে এ হিজরতে বাধা দিতে পারতো। কিন্তু তারা এ হিজরতকে অপছন্দ করে না। কেননা তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সহচরদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তার দুর্বল সহচরদেরকে শাস্তি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন কুরাইশরা বলছে, ফেতনা দেশ হতে অন্যত্র চলে গেলে ভালো হয়। দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে। কুরাইশরা ইচ্ছা করলে এখনো তাদের হিজরতের পথ বন্ধ করে দিতে পারে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার দুর্বল অসহায় সহচরদেরকে কুরাইশরা কোনো পরোয়া করে না।

সাহ্‌লা ভাইয়ের এসব কথা নীরবে শুনছিলো। ভয়ে ও দুঃখে মাঝে মাঝে তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

আবদুল্লাহ আবার বলতে লাগলো, তোমরা স্বামী-স্ত্রী মনে করতে পারো যে, কুরাইশরা তোমাদের সম্পর্কে অবগত নয়। কখনো নয়। এই উৎবা ও অলিদ বিন উৎবা আবু হোযাইফার অবস্থা এরূপ জানে, যেমন সোহাইল ও আবদুল্লাহ সাহ্‌লার অবস্থা জানে। অন্য কুরাইশরাও তোমাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কিন্তু তোমার পিতা ও ভাইয়ের খাতিরে তারা তোমাদেরকে কিছুই বলছে না। আমরাও তোমাদেরকে ভালবাসি বলে তোমাদের কাজে বাধা দিচ্ছি না। তোমরা এ দেশ ছেড়ে অন্যদেশে গিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ লাভ করতে পারলে আমাদেরও সুখের বিষয় হবে। কুরাইশরা যদি বাবাকে এই কথা বলে টিটকারী করার সম্ভাবনা না থাকতো যে, সোহাইল আপন বেটির বিচ্ছেদ সহ্য করতে অক্ষম, তবে শুধু আমি একা তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতাম না। তিনিও আসতেন এবং তোমাকে শেষ বিদায় দিয়ে প্রাণে শান্তি লাভ করতেন। আমার কথা শুনলে তো?

সাহ্লা : হ্যাঁ, শুনেছি।

আবদুল্লাহ : তাহলে তুমি কী বলতে চাও?

সাহলা : ভাই, তুমি আমার পর থেকে কেবল একাই কথা বলছো। আমিতো কিছুই বলিনি।

আবদুল্লাহ : হ্যাঁ, তাতেই তো আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। কিন্তু বিদায়কালীন আলিঙ্গনে কেন তুমি ভীতা হয়েছিলে? তার কারণ আমি এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি।

সাহলা আর না হেসে পারলো না। বললো, আপনি মুশরেক। আমি মুশরেকের শরীর স্পর্শ করা পছন্দ করি না।

আবদুল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে বললো, মুহাম্মদের মুহাব্বত ও তার ধর্মে তোমরা এতই গভীর ভক্ত হয়ে গেছো যে আপন ভাইকে ঘৃণা করছো?

সাহলা ধীরস্থিরভাবে শান্তকণ্ঠে বললো, আপনি যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হতেন তবে আপনি বুঝতে পারতেন, তার মুহাব্বতের তুলনায় ভাই-বন্ধু, মাতা-পিতা ত্যাগ করা মোটেই কঠিন নয়। আমার শ্রদ্ধেয় ভাই! আপনার বুঝা উচিত, আমরা পিতা-মাতা, ভাই-বোন থেকে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক মুহাব্বত করে থাকি। আপনি এখনি বলেছেন যে, কুরাইশরা আমাদের দেশ ত্যাগকে পছন্দ করছে। কিন্তু আপনাদের জানা উচিত, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের আদেশ না দিলে আমরা কখনো হিজরত করতাম না। কারণ আমরা হযরতের নিকট থেকে সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট এমনকি জীবন বিলাতেও পছন্দ করে থাকি এবং হযরতের সংস্রব হতে বঞ্চিত হয়ে দূরদেশে হাজারো প্রকারের আরাম-আয়েশ সুখ-শান্তি আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়।

আবদুল্লাহ : আচ্ছা, তাই না কি? মুহাম্মদ তোমাদের নিকট আপন মা-বাপ, ভাই-বোন এমনকি নিজের জান-মাল থেকেও বেশি প্রিয়? এই বলে সে মাথা নিচু করে বসে ভাবতে লাগলো।

সাহ্লা : হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আপনারাও যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন মুহাব্বত করতেন তবে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন।

এরই মাঝে সাহলার স্বামী আবু হোযাইফা এসে উপস্থিত হলো। সে

দেখলো তার স্ত্রী ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের প্রতি মুহাব্বত ও আকঙ্ক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আর তার ভাই আবদুল্লাহ্ যেন কোন গভীর চিন্তার জালে আটকে আছে। আবু হোযাইফা প্রথমে স্ত্রীর দিকে পরে আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললো, সাহ্লা! বলতো তোমার ভাইয়ের অন্তরে খোদাওয়ান্দে করীম সাকীনা দান করেছেন কি?

সাহ্লা উত্তর দেয়ার আগেই আবদুল্লাহ্ বলতে লাগলো, সাকীনা আবার কি? তোমাদের নিকট বিশেষ অর্থবোধক নতুন নতুন শব্দ শুনতে পাচ্ছি, যা তোমাদের রসনায় নিত্যদাবী আছে আর আমাদের কানে কর্কশ শুনাচ্ছে? আমরা এর কোনো মতলব বুঝতে পারি না। আমার বোন একটু পূর্বেই বলছিল যে, সে তার মা-বাপ, ভাই-বোন ও জান-মাল অপেক্ষা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য অধিক মুহাব্বত রাখে। আর তুমি এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, খোদা আমার দিলে সাকীনা নাজিল করেছেন না কি? বলতো এই সাকীনা কি? আমি দেখতে পাচ্ছি মুহাম্মদ তোমাদের অন্তরে এমন এক যাদু বিস্তার করেছে, যাতে তোমরা আপন বাপ-মা, ভাই-বোন এমনকি নিজ জানের চেয়েও বেশি তার মুহাব্বতে আসক্ত হয়ে গেছো।

আবু হোযাইফা নম্রভাবে বললো, বিস্তার করেননি; বরং তিনি আমাদের অন্তরকে কলুষ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার করে, হেদায়েতের আলোতে আলোকিত করেছেন। এখন আমাদের অন্তরে সাকীনা (শান্তিধারা) বর্ষিত হচ্ছে। আমাদের অন্তর শান্তি আনন্দ ও ঈমানের অমূল্য রত্নে বিভূষিত হয়েছে। তারপর সে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পড়ে তাকে শোনালো– 'যারা আমার (আল্লাহর) সাথে সাক্ষাৎ করার আশা রাখে না সংসারিক জীবনের সুখ-শান্তিতে মজে আছে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে উদাসীন, তাদের কর্মফলের প্রতিদানস্বরূপ দোযখই তাদের ঠিকানা'।

এই আয়াত দুটি শুনামাত্র যুবক আবদুল্লাহর শরীরে কম্পন সৃষ্টি হলো। তার কপাল থেকে ঘাম ঝরতে লাগলো। আবু হোযাইফা কুরআনের পরবর্তী আরো দুটি আয়াত পড়ে তাকে শুনালো– 'যারা ঈমান এনে সৎকাজ করবে, পরোয়ারদিগার তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন, তাদের অট্টালিকাসমূহের তলদেশে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত থাকবে। বেহেশতের ঐ বাগানে তারা সুবহানাল্লাহ বলবে আর পরস্পরে সালামের আদান প্রদান করবে এবং সকল কথার শেষে এ কথাই বলবে– সমস্ত প্রশংসা ঐ–

আল্লাহর জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।'

আবু হোযাইফা শেষের আয়াতটি পড়াতে যুবক আবদুল্লাহর মনের ভয় দূরীভূত হয়ে শান্তি ফিরে এলো। সে সহাস্য বদনে আবু হোযাইফার দিকে তাকিয়ে বললো, ওয়াহ ভাই! আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের বর্ণিত ঐ সাকীনা এখন আমার অন্তরে অবতীর্ণ হচ্ছে। তুমি কি আমাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে যাবে? আমি তার কাছে এই পবিত্র কালাম শিক্ষা করব।

তারপর আবদুল্লাহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত থেকে প্রত্যাবর্তন করে তার বোন সাহলা ভগ্নিপতি আবু হোযাইফা ও তার গোলামপুত্র সাল্লাম এবং সালেমের নিকট কুরআন মজীদের আয়াত শুনতে আরম্ভ করলো। রাতে সে বাড়িতে ফিরে যাবার সময় সাহলা বললো, ভাইজান! আপনিও কি আমাদের সাথে হিজরত করবেন?

আবদুল্লাহ বললো, নিশ্চয়ই! তোমাদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা আমার জন্য খুবই কষ্টকর হবে। কিন্তু আমি মাত্র আজকেই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যবান থেকে কুরআন মজীদ শুনেছি। আমার ইচ্ছা, যতদিন সম্ভব হয় হযরতের কাছাকাছি থেকে শিক্ষা লাভ করা। আল্লাহ হাফেজ! তোমরা যাও, আল্লাহ তোমাদের হিজরত সফল করুক।

পরদিন সকালে আবু হোযাইফা তার ছেলে সালেমসহ সপরিবারে অন্য মুহাজেরদের সাথে আবিসিনিয়ার পথে যাত্রা করলো। এর কয়েক দিন পর মুসলমানদের দ্বিতীয় দল হিজরত করে আবিসিনিয়া গেলো। তাদের সাথে আবদুল্লাহ বিন সোহাইলও গেলো। সোহাইল তার আদরের ছেলে আবদুল্লাহর বিচ্ছেদে মর্মাহত ও ব্যথিত হয়ে বাড়ির বাইরে আসা যাওয়া বন্ধ করে দিলো। যার কারণে কুরাইশদের মজলিসে সোহাইলের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলো না। তাই নেতৃবৃন্দ তার সন্ধানে বের হলো।

একদিন উৎবা বিন রাবিআ, সাইবা বিন রাবিআ ও আবু জাহেল সোহাইলের বাড়িতে হাজির হলো এবং ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলো। সোহাইল প্রথমে অনুমতি দিতে কিছুটা ইতস্তত করলো। কিন্তু

পরক্ষণেই কুরাইশ নেতৃবৃন্দের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা ভেবে অনুমতি দিলো।

সরদারগণ ঘরে প্রবেশ করে সোহাইলকে অত্যন্ত চিন্তিত ও উদাস ভাবাপন্ন দেখতে পেলো। উৎবা বিন রাবিআ বললো, আবু আবদুল্লাহ (সোহাইলের ডাক নাম)! বড়ই আফসোসের বিষয়, আমার ছেলেও তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু আমি তো তার জন্য তোমার মতো ভেঙ্গে পড়িনি।

সোহাইল বললো, তোমার ছেলেই তো সব নষ্টের মূল। সেই তো এ ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। সে কেবল আমার মেয়েকে বেদীন বানায়নি, আমার ছেলেকেও পৈত্রিক ধর্ম থেকে ফিরিয়েছে এবং তাদের নিয়ে আবিসিনিয়ার পথে পাড়ি জমিয়েছে।

আবু জাহেল বললো, কুরাইশ বংশের লোকদের আকল থাকলে এই বেকুফদেরকে সোজা করে ফেলতো। আর তোমার এমন দুর্দশা হতো না। এখনতো দেখতেই পাচ্ছ, অবস্থা কি? কুরাইশরা যদি আমার কথা মানতো তবে আমি এ বিষবৃক্ষ সমূলে উপড়ে ফেলতাম।

শাইবা বিন রাবিআ বললো, আবুল হাকাম (আবু জাহেল)! একটু শান্ত হও। সাবধান! এখনো এমন কাজের সময় আসেনি।

পরিশেষে এ সরদারগণ সোহাইলকে ঘরের বাইরে এনে নানা সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে তার ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে বিদায় হলো। কিছুদিন পর আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরদের একটি দল মক্কায় ফিরে এলো। কেউ বা প্রকাশ্যে আর কেউ গোপনে। আর এ দলের একজন হলো আবদুল্লাহ বিন সোহাইল।

সোহাইল ছেলের প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে তার সাথে দেখা করতে গেলো এবং আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করলো। কিন্তু যুবক আবদুল্লাহ নির্ভয়ে নিঃসংকোচে নিজ সিদ্ধান্তের উপর অটুট থাকলো। তার পিতার কথা তার অন্তরে যেন প্রবেশ করছে না। এমতাবস্থায় সোহাইল হাতে তালি বাজালো। আর তখনি তার সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিধর গোলামেরা এসে আবদুল্লাহকে ঘিরে ফেললো এবং দু'তলা ঘরের নিচে তাকে বন্দি করে রাখলো। ঐ দিন থেকে তার পিতা তাকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দিতে শুরু করলো।

পনের.

মক্কার ইতিহাসে আজকের দিনের মতো খারাপ দিন আর দেখা যায়নি। প্রতিনিয়তই অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও মসিবত তার উপর আসতে লাগলো। এর পূর্বে মক্কা খুবই শান্তিপূর্ণ নিরাপদ শহর ছিলো। এখানকার অধিবাসীরা ছল-চাতুরী কি জিনিস জানতো না। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না। সকল প্রকার কাজকর্ম তারা খুশিমনে সম্পাদন করতো। ধন-সম্পদ মান-ইজ্জত পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতা থাকলেও কেউ কারো উপর কোন ধরনের জুলুম করতো না। তাদের সকল কাজকর্ম এবং পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই সুদৃঢ় ছিলো। তাদের মাঝে কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঝগড়া-বিবাদ হলেও মৌখিক বাদানুবাদেই তার সমাপ্তি হতো এবং দ্রুত তা মিটমাট হয়ে পরস্পর হিত-সাধনের খেয়াল সর্বদা তাদের মধ্যে বিরাজ করতো। আরবের দূরবর্তী অঞ্চলের লোকেরা মক্কার অধিবাসীদের ঈর্ষণীয় অবস্থা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারে বিশেষভাবে অবগত ছিলো। এ কারণেই নিরাপত্তা পছন্দকারী এ শহরবাসী আরবীদের শ্রদ্ধা লাভে সক্ষম হয়েছিলো। তাদের প্রতি সকলেরই মনের বিশেষ ঝোঁক ছিলো। এভাবে মক্কা ও তার চারপাশের এলাকা শান্তিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছিলো। যেখানে এসে আতংকিত ও নিপীড়িত লোকেরা শান্তি লাভ করতো। কিন্তু

আজ মক্কায় এমন দুর্দিন এসে উপস্থিত হয়েছে যে, আকাশ ও যেন তাদের সাথে উপহাস করছে।

প্রভাতসূর্য তার স্বর্ণকিরণ মক্কার পর্বতশ্রেণী মরুপ্রান্তরে বিকিরণ করতে লাগলো বটে কিন্তু ঐ স্বর্ণকিরণে ক্রোধ হিংসা ও দহনের আভাস অনুভূত হতে লাগলো। এতে যেন মক্কার ভবিষ্যৎ ধ্বংস ও বিরানের গোপন সংবাদ রয়েছে। মক্কার এক সম্প্রদায়ের লোকের অন্তর মূর্খতা ও বর্বরতাজনিত হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিলো। তারা এখানের গরীব ও দুর্বল অধিবাসীদের উপর যথাশক্তি অত্যাচার ও জুলুম শুরু করে দিলো। ঐদিন কুরাইশ সরদারগণ মক্কার মসজিদে তাদের প্রাতঃকালীন মামুলি সভায় সমবেত হয়ে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা করলো। কিন্তু দেখা গেল যে, নেতৃবৃন্দের প্রথম সারির অনেকেই আজ অনুপস্থিত।

তারা আজ অন্য কাজে লিপ্ত। তারা ভোর থেকেই তাদের বন্দিদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। দ্বিপ্রহর থেকেই জুলুম শুরু হলো। সন্ধ্যায় সকলে মিলিত হয়ে জুলুমবাজিতে নিজ নিজ বাহাদুরীর ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলো। এই মজলিসে জুলুমকারী ব্যতীত অন্য সর্দারেরাও উপস্থিত রয়েছে। মক্কায় এমন কোন ঘর নেই, যেখানে ইয়াছির ও তার স্ত্রী সুমাইয়া, ছেলে আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব ও বেলাল প্রমুখ মযলুমদের আলোচনা হচ্ছে না। এই মযলুমদের উপর যে অত্যাচারের স্টিমরোলার চলছে, সে ব্যাপারে কুরাইশদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হলো।

বৃদ্ধ ও জ্ঞানী লোকেরা আবু জাহেল ও তার সঙ্গীদের এমনতর বর্বরোচিত অত্যাচার ও জুলুমকে খারাপ মনে করতো বটে; কিন্তু অত্যাচার দ্বারা মুহাম্মদ ও তার সহচরেরা শায়েস্তা হয়ে পিতৃপুরুষদের সাবেক পথে ফিরে আসতে পারে এবং দুর্বল ও গোলামেরা মুহাম্মদের দলে যোগ দিতে বাধাপ্রাপ্ত হবে– এমনটা ভেবেই তারা ঐ জুলুম ও অত্যাচারকে মনে মনে সমর্থন করতো। পক্ষান্তরে কুরাইশ যুবকদল জুলুমের এ অভিনব তামাশাকে তাদের আনন্দ বিনোদন ও হাসি ঠাট্টার বিষয় মনে করতো। মানুষ স্বভাবতই মন্দকর্মের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। আর অনেকে দুঃখ-কষ্টের চিৎকার ও ব্যাকুলতা দেখে আনন্দ অনুভব করে। বিশেষ করে যুবকদের মন পাথরের মতো কঠিন। তাদের জ্ঞান অপরিপক্ক। অতি সহজেই তারা চঞ্চল ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা অত্যাচারিত ও

নিপীড়িত লোকদের হৃদয়বিদারক অবস্থা খুব আগ্রহ ও আনন্দের সাথে উপভোগ করে। এমন দৃশ্য যেন তাদের চোখের প্রীতি ও মনের হর্ষ হয়। তারা ঘুণাক্ষরেও ভাবে না, এমন বিপদ তাদের উপরও কোন সময় আসতে পারে। মানুষ যদি একথা ভাবত যে, সে নিজে কোন অত্যাচারিতের স্থলে পতিত হলে তার কি অবস্থা হতো! এ ধরনের চিন্তা করলে কেউ কারো উপর জুলুম করতে পারতো না।

আবু জাহেলের দলের যুবক ছেলেরা তার নিত্য-নতুন শাস্তি দেয়ার কৌশল দেখে খুব প্রশংসা করতো এবং আনন্দ-ফুর্তি করে খুব আমোদ উপভোগ করতো। মযলুম ও বিপদগ্রস্ত লোকদের অসীম ধৈর্য দেখে তারা কখনো কখনো বিস্ময়ও প্রকাশ করতো। আবু জাহেলের ভাই হারেস বিন হিশাম আবু জাহেলের পুত্র ইকরামাকে বললো, তুমি সুমাইয়াকে দেখেছো! তাকে পটাপট কোড়া মারলে সে কেমন ধড়ফড় করে! কিন্তু তার মনে কোন হা-হুতাশ বা কান্নাকাটি নেই। আমরা তাকে হাতের ইশারায় ভয় দেখালে সে কেবল পার্শ্ব পরিবর্তন করে। কোড়া মারলে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ায় যেন কেউ মাটির নিচ থেকে লৌহকাঠি দিয়ে তাকে উঠিয়ে দিচ্ছে। তখন বেশ মজার দৃশ্য হয়!

ইকরামা বললো, আমার কাছে সুমাইয়ার বৃদ্ধ স্বামী ইয়াছিরের অবস্থা আরো আশ্চর্য মনে হয়। আমাদের দেবতাদের সম্পর্কে ভাল কথা বলার জন্যে আমার আব্বা বার বার কোড়া মেরে তার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করার পরও তার মুখ থেকে ঐ রকম কোন কথা বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বরং সে দেবতাদেরকে আরো গালি দিতে ও মন্দ কথা বলতে থাকে। কিন্তু তার ছেলে আম্মার একদম নীরব থাকে। তার শরীরও মারের চোটে অবশ হয়ে গেছে। নড়াচড়া করতে পারে না। তার পরও তার চেহারা যেন হর্ষোৎফুল্ল। জানি না তা দুঃখের কারণে না সুখের কারণে। তার উৎফুল্ল চোহারা আমার মনে এমন দাগ কেটেছে যে, আমি জীবনেও তা ভুলতে পারব না।

সাফওয়ান বিন উমাইয়া বললো, তুমি বেলাল হাবশী ও তাকে শাস্তি প্রদানকারী যুবকদের দেখলে আরো আমোদ উপভোগ করতে। তারা প্রত্যেকে বেলালকে ধরে নিজের দিকে টেনে দৌড়াতে লাগলো। মনে হলো, তারা বেলালের দেহ টুকরা করে বন্টন করে নিবে। বড়ই আশ্চর্যের

বিষয়, সে কাঁদেও না, এমনকি একটি উহ্ শব্দ পর্যন্ত করে না। সে কেবল তার প্রিয়মানুষ মুহাম্মদ ও তার মাবুদের প্রশংসা করতে থাকে।

খালিদ বিন অলিদ বললো, সোহাইবের অবস্থা আমার কাছে এর চেয়ে আরো বিস্ময়কর মনে হলো। লোকেরা তাকে আগুনে পোড়াতে লাগল, বেত্রাঘাতে তার শরীর রক্তাক্ত করলো, কিন্তু সে বাহাদুরের মতো বেপরোয়া কথাবার্তা বলতে লাগলো। মারপিট খুব বেড়ে গেলে সে কতক্ষণ মুখ বন্ধ করে থাকে। তখন তার কপালে ঘামবিন্দু দেখা দেয়। আবার মারপিট আরম্ভ করলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তখন যেন তার অজ্ঞাতসারে দেবতা সম্পর্কে এমন দু'একটা কথা মুখ দিয়ে বের হলো। সত্যি বলছি, এ দৃশ্য আমার সহ্য হলো না। আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। তাদের কার্যকলাপ আমার কাছে বড়ই অসহ্য ও গুরুতর অন্যায় বলে মনে হলো।

হারেস বিন হিশাম (আবু জাহেলের চাচাতো ভাই) বললো, সাবধান! এমন কথা যেন আর কখনো মুখ থেকে বের না হয়। আমার চাচাতো ভাই আবু জাহেল শুনতে পেলে তোমাকে শাস্তি দিবে।

নির্যাতিত লোকগুলো এমনি কুরাইশ যুবকদের নানা প্রকার আনন্দ-ফুর্তির উপকরণে পরিণত হলো। তারা একবার মযলুমদেরকে উৎপীড়ন করে মজা করতো, আবার তাদের প্রতি কৃত্রিম সহানুভূতিও প্রকাশ করতো। কুরাইশদের নাগপাশে আবদ্ধ গোলাম ও অপর অসহায় নিঃস্ব লোকেরা নিরুপায় হয়ে এ সকল অত্যাচার দেখছিলো। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছে না। কুরাইশ মনিবদের আদেশে তারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুঃখের সাথে মযলুমদের উপর অত্যাচার চালাতে বাধ্য হতো। তারা কুরাইশদের ভয়ে আতংকিত ছিল। কিন্তু মযলুমদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি অন্তরে পোষণ করতো। তারা শুধুমাত্র সুযোগের অপেক্ষা করছে।

কুরাইশদের উপর কখন বিপদ-আপদ আসবে তার অপেক্ষায় প্রহর গোনছে। তারা পরস্পর আলোচনা করে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সহচরদের মধ্যে নেকী ও কল্যাণ আছে। তাদের দলে যোগ দিলে কল্যাণই হবে। কেননা দুর্বলেরা সকলে মিলিত হলে সবল হয়ে যাবে। এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার দুর্বল সহচরদের দ্বারা জালিম কুরাইশদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারেন। যে সকল মুসলমান

কুরাইশদের অত্যাচার থেকে মুক্ত ছিল তারা এ সকল জুলুম-অত্যাচার দেখে মর্মাহত হয়েছে। তারা আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে আশা করছে যে, একদিন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদা পূর্ণ করবেন। মযলুমদের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। জালেম দলকে পরাজিত করে তারা একদিন আধিপত্ব লাভ করবে। অনেক সময় তারা মযলুমদের প্রতি সহনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, অমরা যদি তাদের জায়গায় হতাম, তবে তাদের দুঃখ-কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হতো।

ঐদিন সন্ধ্যায় মক্কার প্রকৃত অবস্থা এমন ছিলো যে, অধিকাংশ বাসিন্দাই এই মযলুমদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন ছিলো। তারা বুঝে উঠতে পারছিলো না যে, তাদের এসকল কার্যকলাপ ন্যায় কি অন্যায় হচ্ছে এবং এর পরিণাম কি হবে। মক্কাবাসীদের চোখ থেকে যদি পর্দা সরিয়ে দেয়া যেতো, তবে তারা দেখতে পেতো, সে রাতে শয়তানের দল খুশিতে বিভোর হয়ে মক্কার চতুর্দিকে উৎসব করছে। তারা হযরতের সহচরগণের উপর জুলুম ও অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করার সংকল্প করেছিলো। তারা মনে করলো, অতিরিক্ত জুলুম উৎপীড়ন দ্বারা মক্কায় তাদের আধিপত্য ও প্রতিপত্তি বজায় থাকবে এবং কুরাইশ সম্প্রদায়ের অন্তরে এর প্রভাব বর্তমান থাকবে।

পরদিন সকালে হযরতের সহচরগণ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কুরাইশদের জুলুম-অত্যাচারের বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এমন এক ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করলেন, যা সাহাবীরা দেখেওনি এবং শুনেওনি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ চোখে ঐ সকল ঘটনা দেখেননি। আল্লাহ তাআলা অহীর মাধ্যমে তাঁকে অবগত করিয়েছেন। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা মক্কার চতুর্দিকে ভ্রমণে বের হলেন। উদ্দেশ্য নিরুপায় ও অসহায় উৎপীড়িত মুসলমানদেরকে কিছু সান্ত্বনা দান করবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমানকে সাথে নিয়ে ইয়াছির পরিবারের নিকট গেলেন। দেখতে পেলেন, তাদেরকে হাত-পা বেঁধে মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপর ভারি পাথর চাপা দেয়া

হয়েছে। কতক্ষণ পর মুশরিকেরা তলোয়ার নেজা ও বল্লম দ্বারা তাদের শরীরে আঘাত করছে। আগুন দিয়ে দাগ দিচ্ছে। কিন্তু তারা তিন ব্যক্তি সম্পূর্ণ নীরব। তাদের মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হচ্ছে না। তাদের এমন নীরবতায় জালেমদের ক্রোধ আরো বেড়ে যায়। জালেমদের ইচ্ছা, মযলুমরা নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে তাদের দেবতাগণ সম্পর্কে প্রশংসামূলক কিছু বলবে।

সকাল থেকেই জালিমরা জুলুম শুরু করতো। ধীরে ধীরে জুলুমের মাত্রা বৃদ্ধি হতো। তারপরও মযলুমানগণ আল্লাহর ধ্যানে থেকে সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করতো। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইয়াছির (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মাত্র তখনই মুশরিকে মক্কা ইয়াছিরের মুখ থেকে একটি কথা শুনতে পেল। ইয়াছির তাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করে দয়ার সাগর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মোধন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যামানার অবস্থা কি এমনই থাকবে?

হযরত বললেন, হে আহলে ইয়াছির! তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে বেহেশত তোমাদের অপেক্ষায় আছে।

ঠিক ঐ সময়ই মুশরিকিনে মক্কা সুমাইয়ার কণ্ঠ থেকেও একটি শব্দ শুনতে পেল। সেও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে বললো, আপনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর সব ওয়াদাই সত্য। এক সময় আম্মার তার আব্বা-আম্মা এবং খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন না করে জালিম কাফিরদের লক্ষ করে বললো, হে আল্লাহর দুশমনেরা! তোদের ইচ্ছেমত আমাদের দেহের উপর জুলুম-অত্যাচার করতে থাক। আমরা এর কোন পরোয়া করি না। বেহেশত আমাদের অপেক্ষায় আছে। লাঞ্ছনা অপমান তোদের জন্যেই।

আম্মারের কথা শুনে মুশরিকে মক্কা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় আম্মারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নেকড়ের দন্ত-নখরের মত তাকে ছিঁড়ে খেতে লাগলো।

অন্যদিকে হযরত আবু বকর ঘুরেফিরে হযরত বেলাল হাবশীকে দেখতে পেলেন। কুরাইশরা তার উপর সাংঘাতিক অত্যাচার করছিলো। তারা বেলালকে আগুনে পোড়াতো। পানির মশকে ডুবিয়ে ধরতো। উত্তপ্ত লৌহ-

শলাকা দ্বারা তার গায়ে দাগ দিতো। বেত্রাঘাতে তার শরীর রক্তাক্ত করতো। উত্তপ্ত বালু, পাথর, ও জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর তাকে শুইয়ে বুকের উপর ভারি পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। তবুও বেলালের মুখ দিয়ে মুশরিকে মক্কার দেবতা সম্পর্কে কোনো ভালো কথা বের হতো না। সে কেবল আল্লাহর একত্ব প্রকাশক অজীফা আহাদ আহাদ বলতে থাকতো।

তার মনিব উমাইয়া বিন খাল্‌ফ ক্লান্ত হয়ে বললো, বেলাল! আমাদের দেবতাগণকে ভালো কথায় ইয়াদ কর। তোর এ শাস্তি বন্ধ করে দেবো।

জবাবে বেলাল বললো, আমার যবান আমার আয়ত্তে নেই।

উমাইয়া ও তার সহযোগীরা বেলালকে শাস্তি দিতে দিতে হয়রান পেরেশান হয়ে তার বুকের উপর থেকে পাথর সরিয়ে তাকে সোজা করে দাঁড় করালো। তারপর তার উভয় হাত-পা লম্বা রশি দিয়ে বেঁধে বাজারের দুষ্ট ছেলেদেরকে ডেকে তাদের হাতে ঐ রশি দিয়ে বললো, তোমরা একে এদিক ওদিক খুব করে দৌড়াও।

ছেলেরা তাকে কখনো ডানে কখনো বামে কখনো সামনে কখনো পিছনে টেনে দৌড়াতে লাগলো। তারা এভাবে হাসি মজা ও তামাশা করছিলো। উমাইয়া সবান্ধবে এই দৃশ্য দেখে খুব আনন্দ উপভোগ করলো। দুষ্ট ছেলেরা বেলালকে যে দিকে টানে, সে সেদিকেই যায়। কোন বিরোধিতা করে না। তার রসনায় একত্ব ঘোষণাকারী শব্দ অনবরত জারি ছিলো। ছেলেরা অবশেষে ক্লান্ত হয়ে রশি ছেড়ে দিলো আর বেলাল দাঁড়িয়ে থেকে আহাদ আহাদ জিকির করতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে উমাইয়া ও তার সহচরেরা অত্যন্ত রাগান্বিত হলো। কয়েকজন এগিয়ে এসে বেলালের বুকে এমন জোরে ধাক্কা মারলো যে, সে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো। তখনো তার মুখে আহাদ আহাদ জিকির জারি ছিলো।

উমাইয়া এই তাওহিদবাণী বন্ধ করার জন্যে বেলালকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে হযরত আবু বকর সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, উমাইয়া! বড়ই দুঃখের বিষয়, তুমি এই লোকটাকে কেন কষ্ট দিচ্ছো?

জবাবে উমাইয়া বললো, হে আবু বকর! তাতে তোমার কি? আমার গোলাম আমি যা ইচ্ছা তা করব।

হযরত আবু বকর বললেন, এই ব্যক্তি প্রথমত আল্লাহর গোলাম। একে

মেরে ফেললে তোমার কেবল পাপই হবে তা নয়; বরং তোমার কিছু দৌলতও নষ্ট হবে। আমি তোমাকে এর চেয়ে একটা উত্তম পন্থা বলে দিচ্ছি।

উমাইয়া বললো, কি পন্থা?

হযরত আবু বকর বললেন, আমি একে খরিদ করব। তুমি এর মূল্য কত চাও বলো?

উমাইয়া বেলালকে শাস্তি দিতে দিতে হয়রান ও বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাই সে বললো, এর মূল্য সাত আওকিয়া স্বর্ণ দিবেন।

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, বেশ তো, তুমি একে মুক্ত করে দাও। আর আমার সাথে আসো, আমি মূল্য দিয়ে দিবো।

উমাইয়া : আগে মূল্য পরিশোধ করেন, তবে ছেড়ে দিবো।

হযরত আবু বকর : ধিক্ উমাইয়া, তুমি কি বললে? তুমি কি আমাকে কখনো লেনদেনের ব্যাপারে কথা নড়চড় করতে দেখেছো?

উমাইয়া লজ্জিত হয়ে বললো, ঠিক আছে। আপনি একে নিয়ে যান, মূল্য পাঠিয়ে দিলেই হবে।

হযরত আবু বকর বললেন, আমি বাড়ি গিয়ে তোমাকে নির্ধারিত মূল্য দিয়ে দিবো। তারপর বেলালের হাত ধরে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাকে নানাবিধ মধুময় বাক্যে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর উমাইয়ার কাছে মূল্য পাঠিয়ে দিলেন।

উমাইয়া মূল্য গ্রহণ করেছে– এ সংবাদ পাওয়ার পর হযরত আবু বকর হাসিমুখে বেলালকে বললেন, বেলাল! আজ থেকে তুমি আজাদ। যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারো।

সন্ধ্যাবেলা হযরত আবু বকর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করে বেলালের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকেও বেলালের ক্রয়ে শরীক করে নাও।

হযরত আবু বকর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো বেলালকে আজাদ করে দিয়েছি।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে

সাথে নিয়ে কুরাইশদের অন্য এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক ভয়ানক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখলেন। সেখানে একটি আগুনের কুণ্ডলি প্রজ্জ্বলিত ছিলো। এক ব্যক্তির হাত-পা শক্তভাবে বেঁধে লোকেরা তাকে অগ্নিকুণ্ডের কাছে নিয়ে গেলো। আগুন তাকে ধরার উপক্রম হলে সামন্য দূরে সরিয়ে এনে তাকে বাঁধা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলো। তারপর এক কমবখ্‌ত অগ্রসর হয়ে ঐ ব্যক্তির বুকে সজোরে পদাঘাত করল। লোকটি ধড়াস করে মাটিয়ে পড়ে গেলো। দর্শকেরা আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠলো। এভাবে তারা লোকটাকে বার বার শাস্তি দিতে লাগলো।

এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমাদের মাবুদকে ভাল শব্দে উচ্চারণ কর। মুহাম্মদ ও তার ধর্মকে খারাপ বল। অন্যথায় তোকে এই আগুনে জ্বালানো হবে, অথবা মাটিতে আছাড় খেতে খেতে মারা যাবি। কিন্তু লোকটি ইসলামের প্রেমে আত্মহারা। সে কেবল এই শব্দগুলি বলতে লাগলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন।

ঐ লোকগুলো তাকে আগুনে পোড়ানোর জন্য বের করতে লাগলো। আবার দাঁড় করিয়ে আছাড় দিতে লাগলো। অবশেষে লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। তার এই অবস্থা দেখে জালেমরা বলতে লাগলো, এখন ক্ষান্ত দাও। এ মরে যায় কিনা! তাহলে বনি জুহারার নিকট তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

হযরতের সাথীগণ এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে এসে অন্য সাহাবীদের নিকট ঐ নিপীড়িত ব্যক্তি খাব্বাব বিন আরীত-এর বিস্তারিত বিবরণ বয়ান করলেন।

কুরাইশ কর্তৃক দুর্বল মুসলমানদের উপর এ ধরনের জুলুম-অত্যাচার সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই তাদের ধর্মের কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করতে পারলো না। তবে হ্যাঁ, অনেকে নির্যাতন সহ্য করতে করতে নিজের জান বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ নিকট শাহাদাতের উচ্চমর্যাদা লাভ করলো। কেউ কেউ এ ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় বেহুঁশ হয়ে জালেমদের দেবতা সম্পর্কে দু'একটা ভাল শব্দ উচ্চারণ করেছিলো মাত্র। কিন্তু তাদের অন্তর ঈমানের উপর অটল ছিলো।

একদিন দুপুর বেলা কোন এক ইস্যুতে কুরাইশরা সমবেত হলো। আবু জাহেল সেই সভায় বাহাদুরির সাথে দাবী করে বসলো, আমি ইয়াছির পরিবারবর্গকে নিজের ইচ্ছে মতো যে কোন কথা বলাতে পারবো। তাদেরকে এত মারপিট ও যাতনা করেছি যে, তারা মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে ছিলো। যতক্ষণ তারা কুরাইশদের মাবুদ সম্পর্কে ভাল শব্দ উচ্চারণ করেনি, মুহাম্মদ ও তার ধর্মকে মন্দ বলেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ছাড়িনি।

উৎবা বিন রাবিআ বললো, আবুল হাকাম! তুমি তা করতে পারবে না। ইয়াছির বড় বাহাদুর লোক। আমার বিশ্বাস, সে মরে গেলেও তোমার কথা মানবে না।

আবু জাহেল বললো, যদি সে আমার কথা মেনে নেয়? তোমরা চাইলে তোমাদের সামনেই বলাতে পারি।

উৎবা বিন রাবিআ : এসব কথা বাদ দাও আবুল হাকাম! এটা তোমার খামখেয়ালি ছাড়া আর কিছু নয়। আমার বিশ্বাস, তুমি এই বুড়ো বেচারার প্রাণনাশই করবে মাত্র।

আবু জাহেল : যদি আমাদের মাবুদ সম্পর্কে ভাল কথা তাদের মুখ দিয়ে বের করাতে পারি, তবে?

উৎবা বললো, তাহলে তোমাকে বিশটি উট পুরস্কার দিবো।

শায়বা বিন রাবিআ বললো, আমিও বিশটি উট দিবো।

আবু জাহেল : তোমাদের মাল-দৌলতের কোন পরোয়া নেই বলে মনে হয়, আজ তোমরা বড়ই উদার সেজেছো!

উৎবা : আচ্ছা ইয়াছির যদি তোমার হাতে মারা যায়?

শায়বা : আর যদি তুমি তার মুখ থেকে কোন ভালো কথা বের করাতে ব্যর্থ হও?

আবু জাহেল : তবে তোমাদের রায় মেনে নিবো।

উৎবা : না, আমরা কিছুই বলবো না। তুমি তোমার ব্যর্থতার অনুতাপই ভোগ করবে।

অবশেষে এই তিন দুর্দান্ত জালেম একসাথে ইয়াছির, সুমাইয়া ও আম্মারের উপর জুলুম-অত্যাচার অনুশীলন করতে বের হলো। তারা যথাস্থানে

পৌঁছলে আবু জাহেল বন্দিদের আনার জন্য তার গোলামদেরকে আদেশ করল। গোলামেরা পূর্বেই বন্দিদেরকে এনে রেখে ছিলো। আবু জাহেল নির্মমভাবে তাদেরকে সজোরে কোড়া মারতে শুরু করলো। আগুনে পোড়ালো। তারপর পানির মশকে ডুবিয়ে রাখতে গোলামদের আদেশ করলো। গোলামেরা তাদেরকে এভাবে পানিতে ডুবিয়ে ধরলো যে, তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারপর তাদেরকে পানি থেকে উঠিয়ে বাইরে বাতাসে এনে তাদের মুখ থেকে প্রত্যাশিত কিছু কথা বের করার অপেক্ষা করলো। কিন্তু বন্দিরা কেবল আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণ করতে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করছিলো।

আবু জাহেল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললো, সুমাইয়া! আমাদের মাবুদদেরকে ভাল আর মুহাম্মদকে খারাপ না বললে এমন শাস্তি ভোগ করতে করতে প্রাণ হারাবে। মনে রেখ, মুহাম্মদ ও তার খোদাকে অস্বীকার না করলে তুমি আজ সন্ধ্যা দেখতে পাবে না। তার পূর্বেই তোমার জীবনলীলা সাঙ্গ হবে।

সুমাইয়া অতি ধীর ও কাতরস্বরে বললো, তোমাদের মাবুদেরা ধ্বংস হোক। মরণের চেয়ে প্রিয় বস্তু আমার কাছে আর কিছু নেই। তাই আমি কামনা করছি, তোমার অপয়া চেহারা যেন আর দেখতে না হয়।

উৎবা ও শায়বা বিন রবীআ সুমাইয়ার একথা শুনে হেসে ফেললো। আবু জাহেল ক্রোধে ও ক্ষোভে রণমূর্তি হয়ে সুমাইয়ার পিঠে লাথি মারতে লাগলো। তারপরও সুমাইয়া বলে যাচ্ছে, তোমাদের দেবাতারা ধ্বংস হোক।

আবু জাহেল উন্মত্ত হয়ে তার হাতের নেজা দ্বারা সুমাইয়াকে সজোরে আঘাত করলো। সুমাইয়া একটা কাতরধ্বনি করে মৃত্যুবরণ করলো। ইসলাম ধর্মে সর্বপ্রথম শাহাদাতের মর্যাদা তার ভাগ্যেই জুটলো। নিজ চোখের সামনে স্ত্রীর মৃত্যু দেখে ইয়াছির বলে উঠলো, খোদার দুশমন! তুমি একে হত্যা করলে? তোমার ও তোমার দেবতার উপর লানত!

আম্মার বললো, খোদার দুশমন! তুমি আমার মাকে হত্যা করলে? তোমার ও তোমার দেবতাদের উপর খোদার লানত! তুমি জ্বলে পুড়ে মর। আল্লাহর রাসূল আমার মাকে বেহেশতের ওয়াদা দিয়েছেন।

ইয়াছির বললো, খোদার ওয়াদা প্রকৃতই সত্য। কিন্তু আবু জাহেল তাকে

আর কিছু বলার অবসর দিলো না। তার পিঠে সজোরে পদাঘাত করলো। ইয়াছির কাতরকণ্ঠে আল্লাহ আল্লাহ বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন এবং দ্বিতীয় শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

উৎবা ও শায়বা বললো, কি হে আবুল হাকাম! তুমি না বলেছিলে ইয়াছির ও তার স্ত্রীর দ্বারা তোমার নিজ ধর্মের স্বীকার করাতে পারবে? আর না পারলে আমরা যা করি তা মানবে?

আবু জাহেল চুপ হয়ে গেলো। কিন্তু কুরাইশ বংশের অন্য সরদারগণ বলে উঠলো, হ্যাঁ, সত্যিই তো সে ঐ কথা বলেছিলো। আমরাও তার সাক্ষী আছি।

উৎবা বললো, এখন তোমার উচিত আম্মারকে ছেড়ে দেয়া, যেন সে তার পিতা-মাতাকে দাফন করতে পারে।

সেদিন আবু জাহেল ক্রোধে ও ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে ঘরে ফিরলো। তার চিন্তা ও ক্রোধের প্রকৃত কারণ বোঝা গেলো না। এই দুই শহীদ তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করে হাতছাড়া হয়ে গেলো। হয়তো এজন্য তার ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। অথবা তারা দৃঢ়সংকল্প থেকে সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করেও কোন ধরনের আতংক চঞ্চলতা ও ধৈর্যহীনতা না দেখিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলো। এটাই তাকে ভাবান্বিত করেছে। এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দ্বারা কুরাইশের প্রাচীন ধর্মের উপর মুহাম্মদের নবপ্রচারিত ধর্ম প্রভাব বিস্তার করলো। তারা দেখলো, মুহাম্মদ-এর সহচরেরা তার জন্য জীবন কুরবান করছে। ধর্মের জন্য তারা শহীদ হচ্ছে। কুরাইশদের কিছু শরীক লোক ও নিঃস্ব হলিফেরা হযরতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তার ধর্মে বিশ্বাসী হচ্ছে। যদিও অধিকাংশ লোক নিজেদের ধর্মবিশ্বাস গোপন করে মনের ভাব খুব কমই প্রকাশ করে থাকে। তারা শেষে হযরতের প্রতি ঈমান এনে তার দিকে দৌড়াচ্ছে। মক্কার নিঃস্ব লোকেরা ও গোলাম সম্প্রদায়, যারা শরীফ ও রঈসগণের অতি আস্থাভাজন ছিলো ও তাদের হুকুমের তাবেদার ছিলো, তারাও যেন কিছুটা বিপ্লবী হয়ে উঠেছে। আর এখন তাদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি অপছন্দ করছে। কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে। এটাও দেখা গেলো, কোন কুরাইশবংশীয় লোক কোন আজাদ গরীব লোককে বা গোলামকে পাকড়াও করে সাবধান করার উদ্দেশ্যে শাস্তি দিলে সে তাতে ভয় করে না। পালিয়ে অন্য কোথাও যায়

না। আদেশও মান্য করে না। বরং সকল প্রকার শাস্তি উৎপীড়ন জুলুম অত্যাচার সন্তুষ্টচিত্তে সহ্য করার জন্য তাদের বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠে। তাদের আনন্দোৎফুল্ল চেহারা শাস্তিদাতাদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করলো। জানি না, হয়তো বা আবু জাহেল উল্লিখিত কারণে রাগান্বিত ও ভাবান্বিত হয়েছিলো। অথবা এ কারণে যে, কুরাইশদের এমন ধারাবাহিক অত্যাচার, জুলুম ও শাস্তি প্রদানের কথা শুনে এবং সময় সময় স্বচক্ষে দেখেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোটেই ভয় করছেন না। কোন রকম প্রভাবান্বিত হচ্ছেন না। তার নবপ্রবর্তিত ধর্ম প্রচারে মোটেই বিরত হচ্ছেন না। তাছাড়া তিনি নিজের সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নিপীড়িত মুসলিমদের নিকট গিয়ে তাদেরকে এমন সান্ত্বনাবাক্য শুনাচ্ছেন, যার কারণে তারা সমস্ত দুঃখ-যাতনা ভুলে গিয়ে সকল প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করতে দৃঢ়সংকল্প হচ্ছে।

যা হোক, কুরাইশদের সাথে এর চেয়ে বেশি আর কি মজাক ইসলামের নবদীক্ষিত মুষ্টিমেয় লোকেরা করতে পারে! তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির উপেক্ষা দুর্বল মুসলমানদের পক্ষে এর অধিক আর কী হবে? কুরাইশদের চারদিকের আরবেরা কী বলবে, যখন তারা জানতে পারবে যে, কুরাইশ বংশের দেহে এমন একটা কণ্টক বিদ্ধ হয়েছে, যা তাদের ছোট বড় সকলকেই অস্থির করে তুলেছে। এ কণ্টক বের করার শত চেষ্টা তদবীর করা সত্ত্বেও তা দিন দিন আরো বেশি বিষাক্ত হচ্ছে। হতে পারে, আবু জাহেল এসব বিষয়ে চিন্তা করে পেরেশান হয়েছে। অথবা যে অত্যাচার উৎপীড়ন সে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে আসছে, তা কুরাইশ সরদারগণও নিরর্থক মনে করছেন। এতে তার নিজেরও কোন স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না, দেবতাদেরও কোন লাভ হচ্ছে না। বরং এ কঠোর শাস্তি বিধান যাতে প্রাণনাশ সংঘটিত হলো– কুরাইশরা মোটেও তা পছন্দ করছে না। পক্ষান্তরে এমন নিষ্ঠুর শাস্তির প্রতিক্রিয়াতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীরা দিন দিন দৃঢ়পদ ও শক্তিশালী হচ্ছে। অথবা এটাও তার ক্রোধের কারণ হতে পারে যে, উৎবা ও শায়বা বাজিতে তাকে মাত করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। তার এ ব্যর্থতার ফলে এটাও হতে পারে যে, কুরাইশ সম্প্রদায়ের মাঝে তার প্রাধান্য আর থাকবে না। উৎবা ও শায়বা প্রাধান্য লাভ করবে।

তার ক্রোধের কারণ যাই হোক, সে বড় উগ্র মেজাযে ও পেরেশান হয়ে ঘরে ফিরলো এবং সারা রাত একাকী দুশ্চিন্তায় কাটালো। এদিকে ক্ষতদেহ আম্মারকে তার পিতা-মাতার মৃতদেহসহ লোকেরা তুলে নিয়ে তার ঘরে পৌঁছে দিলো। এই লোকদের মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই ছিলো। সকলে মিলে আম্মারের পিতা-মাতার মৃতদেহ দাফন করলো। দাফনের পর মুশরিকরা চলে গেলো। আম্মার মুসলমানদের নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। আম্মার তখনো শারীরিক জুলুম অত্যাচার যন্ত্রণা ও পিতা-মাতার বিয়োগ বেদনায় কাতর ছিলো। কিন্তু তার অন্তর ঈমানের দৌলতে বলিয়ান ছিলো।

হযরত উসমান বিন আফফান বললেন, আম্মার! তুমি পিতা-মাতার জন্য দুঃখ করো না। তারা নিজ হায়াত পূর্ণ করে তোমার আগেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের অনন্ত সুখ-শান্তি লাভ করেছে। তুমি কি শুননি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে সবর করার জন্য উপদেশ দিয়ে এই দুআ করেছেন– আয় আল্লাহ! ইয়াছির পরিবারের প্রতি দয়া করো। তাদেরকে মাফ করে দাও।

আম্মার বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। মাতা-পিতার মৃত্যুতে আমার দুঃখ না করে সন্তুষ্ট হওয়া দরকার। যেহেতু তারা আমার পূর্বে জান্নাতবাসী হয়েছেন। হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ওয়াদা করেছেন। খোদার ওয়াদা সুনিশ্চিত।

হযরত উসমান বললেন, তোমার জন্যও তেমনি ওয়াদা করেছেন।

আম্মার বললো, আফসোস! আমিও যদি আব্বা-আম্মার সাথে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে পারতাম! কিন্তু এখন তারা চলে গেছেন। আমি দুনিয়ার সংগ্রামের জন্যে আটকে থাকলাম। মানুষের নফস দুর্বল। এখন আমি একাই জুলুম অত্যাচারের শিকার হবো। তারা আমাকে গুনাহ ও অন্যায় কাজের দিকে টানবে। জানি না, আমি কতদূর ঠিক থাকতে পারব।

উসমান বললেন, খোদার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। দুনিয়াতে ভাল-মন্দ উভয়বিধ কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বর্তমান। অতএব, দুনিয়ার হায়াতকে অতি মূল্যবান ও গনিমত মনে করতে হবে। এটা অবহেলার বিষয় নয়।

আম্মার : হ্যাঁ, আপনি যাথার্থই বলেছেন।

তারপর সে এমন ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ালো যেন তার কোন দুঃখই হয়নি। হযরত উসমান ও অন্য বন্ধু-বান্ধবদের সম্বোধন করে বললেন, আমরা এখানে অনর্থক বসে না থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গেলে ভাল হয়। তারপর সকলে মিলে আরকাম বিন আরকামের ঘরে উপস্থিত হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নসীহত করলেন এবং কুরআনের আয়াত শোনাতে লাগলেন।

আবু জাহেল উৎবা বিন আবি রবিআ ও তার ভাইকে বললো, তোমরা আম্মারের মৃতপ্রায় প্রাণটাকে অনর্থক বাঁচিয়ে রাখলে। তোমরা বাধা না দিলে আজ দু'জনের স্থলে তিন জনের দাফন হতো।

উৎবা বললো, আমরা তো তোমার বোঝা হাল্কা করে দিয়েছি।

আবু জাহেল কৃত্রিম উপহাসে বললো, আমি চাই না যে, আমার দুশমন মরে আমার শাস্তি ও নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করুক। বরং আমি চাই, ওদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করি। আযাব ও কষ্টের তিক্ত স্বাদ বার বার ভোগ করাই। আমি তোমাদের লাত ও উজ্জার শপথ করে বলছি, আজ থেকে তোমরা আমার ও আম্মারের মধ্যবর্তী হয়ো না। না হয় বনি মাখযুমের সাথে তোমাদের লড়াই হতে পারে। ইয়াছির আমাদের (মাখযুম গোত্রের) হলিফ ছিলো। সুমাইয়া আমাদের বাঁদী ছিলো। আম্মারকে আমরা এখনো গোলাম মনে করি।

শায়বা বললো, কিন্তু তোমার চাচা আবু হোযাইফা আম্মার ও তার দুই ভাইকে আজাদ করে দিয়েছিলো।

আবু জাহেল বললো, তা যাই হোক, তার অভিভাবক আমরাই।

উৎবা কণ্ঠস্বর নরম করে বললো, আচ্ছা, এ কথা!

আবু জাহেল তার মনের ভাব গোপন রাখলো। আল্লাহ্ পাকও আম্মারের জন্য বহু মর্যাদা গোপন রেখেছিলেন। যতদিন আম্মার মক্কাতে ছিলো, আবু জাহেল ক্রমাগত তাকে উৎপীড়ন করছিলো। নিত্য-নতুন জুলুম অত্যাচার করতো। আম্মারকে জীবিত রাখলো বটে কিন্তু যখনই ইচ্ছা হতো, তখনই তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে অন্য মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়ার নিষ্ফল চেষ্টা করতো। সে যেন শয়তানের সাথে এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, যে সমস্ত শাস্তি আম্মারের পিতা-মাতাকে দিতে পারেনি আম্মারকে তা দিতে হবে।

যেসব কথাবার্তা তার পিতা-মাতার মুখ দিয়ে বের করাতে পারেনি, তার মুখ দিয়ে তা বের করাতে হবে এবং যে কোন উপায়ে আম্মারকে বাধ্য করতে হবে।

সে যেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খারাপ বলে, আর কুরাইশদের দেবতাদেরকে ভাল নামে ডাকে। এই কাজে শয়তান তার সহকর্মী ছিলো। এভাবে কিছুদিন নির্যাতন করার পর আম্মারকে অল্প দিনের জন্য অবসর দিলো।

আম্মারও বুঝাতে পারলো, সে এখন জুলুম নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছে। সে প্রতিদিন সকালে আরকাম বিন আরকামের ঘরে গিয়ে হযরতের ওয়ায নসীহত শুনতো এবং সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে ফিরতো। সে নিজের বাড়িতে একটি ছোট মসজিদ তৈরি করে সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত ইবাদত করতো। আল্লাহ্ পাক তার শানে এ আয়াত নাযিল করেছেন– 'মুশরিক ভাল না ঐ ব্যক্তি ভাল, যে রাত জেগে ইবাদত করে ও আখিরাতের ভয় করে এবং আল্লাহর রহমতের আশা রাখে? বলুন, যাদের ইল্‌ম আছে আর যাদের ইল্‌ম নেই, উভয় কি সমান? জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।'

একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আম্মার ব্যতীত অন্য কিছু সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। তখন আম্মারের কথা উঠলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আম্মারকে আল্লাহর রাস্তায় ভীষণ কষ্ট দেয়া হয়েছে।

সেদিন দুপুরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কোনো এক জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন আবু জাহেল তার পুরনো দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছে। একটা ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে নিকটে বড় বড় চামড়ার মশক পানিতে ভর্তি করে রাখা হয়েছে। আম্মারকে পানির মশক ও অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কুরাইশদের বেকুফদল আম্মারকে নেজা মারছিলো আর আগুনে পোড়াচ্ছিলো। আম্মার ধৈর্যের সাথে নীরবে আল্লাহর নাম জপছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ভয়ংকর দৃশ্য দেখে খুবই দয়ার্দ্রস্বরে বললেন, আগুন! তুমি আম্মারের উপর এমন ঠাণ্ডা হয়ে যাও যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আরামদায়ক ও শীতল হয়েছিলে।

আবু জাহেল এভাবে আম্মারকে অনেক দিন আগুনে পুড়িয়ে ছিল, যাতে আম্মারের মৃত্যু অনিবার্য ছিলো। কিন্তু আল্লাহ পাকের ফরমান– 'আমাকে ডাকো! আমি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করবো। আম্মারের জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় বান্দা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছিলেন। তাই সে এমন মারাত্মক কষ্ট ও আযাবের মধ্যেও বেঁচে থাকলো।

বেলা শেষে আবু জাহেল আম্মারকে ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরলো। কিছুদিনের জন্য আম্মারকে শাস্তি দেয়া বন্ধ রাখলো। আম্মার মনে মনে ভাবলো, তার উপর পুনরায় জুলুম অত্যাচার করা হবে না। কিন্তু আবু জাহেল শাস্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করার জন্যে কিছুদিনের জন্য ঢিল দিয়েছে।

একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মারকে বড় পেরেশান দেখলেন। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মারের নিকট এসে অতি স্নেহের সাথে তার চোখ মুছে দিয়ে বললেন, ওহে সুমাইয়ার পুত্র! কাঁদছো কেন? কাফের দল বুঝি তোমাকে পানিতে ডুবিয়েছে! আর তুমি আতংকিত হয়ে এমন কোনো কথা বলে ফেলেছো? কোনো ভয় নেই, আবার যদি তারা তোমাকে অমন শাস্তি দেয়, তবে তুমি অমন বলতে পারো।

কিন্তু কাফেররা আম্মারকে আর ঐ রকম শাস্তি কিছুদিনের মধ্যে আর দেয়নি। কিছুকাল অবসর দিয়েছিলো। তারপর আবার ভীষণ শাস্তি দিতে লাগলো। একদিন আম্মার খুব পেরেশান হয়ে কাঁদতে কাঁদতে হযরতের দরবারে উপস্থিত হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আম্মার কী অবস্থা?

আম্মার আবেগভরে বললো, নিতান্ত দুঃসংবাদ! আজ আপনার সম্বন্ধে খারাপ শব্দ ও তাদের মাবুদ সম্বন্ধে ভালো ব্যবহার না করা পর্যন্ত আমাকে ছাড়েনি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মনের ভাব কি রকম?

আম্মার বললো, আমার ঈমান পরিপূর্ণ ও সন্তুষ্ট।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কোন দোষ নেই। আগামীতেও যদি তারা তোমাকে অমন বাধ্য করে, তবে তুমি তা করো।

এ ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকের এই আয়াত নাযিল করেছেন– 'যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে যায়, (ঐ ব্যক্তি নয়, যাকে কুফুরীর প্রতি বাধ্য করা হয়। কিন্তু তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ও সন্তুষ্ট থাকে। বরং এ সকল ব্যক্তি যারা অন্তরের সাথে কুফুরী করে) তাদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত এবং তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে'।

আম্মার এমন ধারাবাহিক শাস্তি ভোগ থেকে ঐ সময় নিষ্কৃতি পেলেন, যখন আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়াতে হিজরত করার আদেশ দিলেন। তখন আম্মারও আবিসিনিয়াতে হিজরত করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর আম্মারও মদীনায় এসে হযরতের সাথে মিলিত হয়ে শান্তিতে জীবন-যাপন করার সুযোগ পেলেন।

ষোল.

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দুই বড় গোত্র আওস ও খাযরাজদের থেকে ইসলামের দাওয়াত প্রচার বিষয়ে এবং তার নিজ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, যেন তারা হযরতকে মদীনায় আবাসস্থান দিয়ে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে। আর কেউ যদি তাকে আক্রমণ করতে আসে, তাহলে তাদেরকে প্রতিরোধ করবে। যেন আল্লাহ্র বাণী সফলতার সাথে মানব সমাজে প্রচার করতে পারেন। এ ওয়াদার উপর আওস ও খাযরাজ বংশের সরদারগণ হযরতের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলো। এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁর রাসূল ও অন্য মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূত্রপাত হয়েছিলো।

হযরতের একজন প্রচারক সেখানে ইসলাম প্রচার করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করার আদেশ দিলে মুসলমানরা চারদিক থেকে দলে দলে মদীনায় আসতে লাগলো। কিন্তু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র তরফ থেকে তাঁর নিজের হিজরতের আদেশের অপেক্ষায় মক্কাতেই অবস্থান করলেন। একদিন হযরতের আগমন সংবাদ শুনে একদল মুহাজির ও আনসার হযরতকে অভিবাদন জানাতে মদীনার অদূরে কুবা নামক স্থানে

উপস্থিত হলো। তারা অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে হযরতের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলো। মক্কাতে তারা যেমন জামাতে নামায পড়তো মদীনাতেও তেমনি নামায পড়তে লাগলো।

সালেম বিন আবু হোযাইফা, যিনি সবচেয়ে ভাল কিরাত পড়তেন, তাকে জামাতের ইমাম বানালেন। অথচ তখন হযরত ওমর, উসমান প্রমুখ বড় বড় মুহাজির সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আওস ও খাযরাজ বংশের মুনাফিক ও মুশরিকরা দেখলো মুসলমানরা সালেমকে সর্বদা জামাতের ইমাম বানায়।

প্রথমে তারা সালেমকে একজন বড়লোক মনে করতো। কিন্তু পরে তাদের স্মরণ হলো এবং চিনতে পারলো যে, এই সালেমকে ইহুদি ব্যবসায়ী সাল্লাম বিন হোবাইর এক গোলাম বাচ্চা হিসাবে বিক্রি করার জন্যে আরব ও ইহুদি ব্যবসায়ীদের নিকট উপস্থিত করেছিল। সে না আরবী ভালো বলতে পারতো, না বুঝতে পারতো। কেউ পছন্দ করে তাকে নেয়নি। পরে সোবাইতা নামক এক সদাশয় মহিলা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে খরিদ করে নেয়। কেউ কেউ বলতে লাগলো, সাল্লাম বিন হোবাইর এখন জীবিত থাকলে তার এই গোলাম বাচ্চার পদমর্যাদা দেখে স্তম্ভিত হতো।

আবার কেউ কেউ বললো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের নামাযের ইমামতি এমন এক ইরানবাসী করতো, যে আগে গোলাম ছিলো। অন্যেরা উত্তরে বললো, হ্যাঁ, এই লোকগুলোর রীতিনীতি নতুন ধরনের। তারা গোলামকে সরদার বানিয়েছে। আজাদ ও গোলামের ভেদাভেদ মুছে দিয়েছে। কুরাইশদের প্রতি আমাদের সাহানুভূতি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বেচারারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সহচরগণের মধ্যে বাধ্য হয়ে এমন অবাঞ্ছিত ব্যবহার করেছে। যদি সম্ভব হতো, তবে আমরাও কুরাইশদের মতো এদেরকে নির্যাতন করে দেশ থেকে বের করে দিতাম। কিন্তু এখন আমরা তা করতে পারি কি?

এক ব্যক্তি বললো, দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমরা এখন তা করতে পারি না। কেননা, আমাদের বংশের বড় বড় লোকেরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনে তার ভক্ত হয়ে গেছেন।

এদের মধ্যে কেউ কেউ এ সকল কথা শুনে বড় বিস্ময় প্রকাশ করতে

লাগলো। এ কারণে তারা নীরব হয়ে গেলো। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে এসব কথা আলোচনা করতো। প্রকৃত ব্যাপার অবগত হওয়ার পর তারা আরো আশ্চর্য হলো। তারা দেখলো, মুহাজিরগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই পূর্বে গোলাম ছিলো। মুসলমান হয়ে তারা আজাদী লাভ করেছে। এখন তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তারা আরো দেখতে পেলো যে, মুসলমানদের মধ্যে আজাদ ও শরীফ লোকেরা এই আজাদ-গোলামদের প্রতি কতই না ভালো ও ভদ্র ব্যবহার করে অনুপম ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেছে। তারা স্ববংশীয় মুসলমানদের সাথে এ সকল বিষয়ে আলোচনা করেও জানতে পারলো যে, ইসলামে আজাদ ও গোলামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মানুষের মধ্যে তাকওয়া ও সৎকাজ ব্যতীত অন্য কিছুই পার্থক্য আনতে পারে না। এই বাস্তব ও পছন্দনীয় নীতি শুনে তাদের অন্তর সাম্য-নীতির প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে তারাও ইসলামের গণ্ডির ভেতরে প্রবেশ করে সালেম বিন আবু হোযাইফার ইমামত কবুল করতে আগ্রহী হলো। যিনি গতকাল পর্যন্ত গোলাম ছিলেন তিনি আজ কুরাইশ রঈসগণের এবং আওস ও খাযরাজের সরদারদের নামাযের ইমামতি করছেন।

সতের.

অবশেষে একদিন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরম বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.)সহ মক্কা থেকে হিজরত করে কুবা নামক স্থানে পৌছলেন। হযরতের সংবর্ধনা দেয়ার জন্য সমবেত মুহাজির ও আনসারগণ তার শুভাগমনের অপেক্ষায় ছিলো। তারা হযরতের জন্য আন্ত রিকভাবে আগ্রহী ছিলেন। মদীনার লোকেরাও তার জন্য পরম সন্তোষের সাথে অপেক্ষায় ছিলো। তার শুভাগমনে মদীনার ঘরে ঘরে আনন্দের স্রোত বইতে লাগলো। আনসারগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাজিরদের খাতির ও খেদমত প্রতিযোগিতার সাথে করতে লাগলো। ঐ দিন জোহরের নামাযের পর জনৈক আনসার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এক ছড়া খেজুর পেশ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথী হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) ঐ খেজুর খেতে লাগলেন। এমন সময় দেখা গেলো দূর থেকে এক ব্যক্তি এদিকে আসছে। সে নিকটে এসে সালাম দিয়ে তাদের সাথে খেজুর খেতে বসে গেলো। ইনি ছিলেন সোহাইব, যার আগমনের ব্যাপারে একটু আগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সোহাইব অনেক কষ্ট করে এ পর্যন্ত এসেছেন। সফরের কষ্ট ও ক্ষুধায় তিনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন। পথে তার একটি

চোখে রোগ দেখা দিয়েছিলো। যার কারণে তিনি ভালভাবে পথ দেখতে পারেননি। বন্ধু-বান্ধব সকলকে সালাম করে তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। সম্মুখে খেজুরের ছড়া দেখে ক্ষুধার্ত সোহাইব খেতে শুরু করে দিলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সোহাইব! চোখের অসুখ নিয়ে কিভাবে খেজুর খাচ্ছ?

সোহাইব আনন্দের সাথে খেতে খেতে বললো, হুজুর! আমি সুস্থ শরীরে খেজুর খাচ্ছি।

এমন জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উপস্থিত হাজিরানে মজলিস সকলেই হাসতে লাগলেন। ভালোমত পেটপুরে খেজুর খাওয়ার পর সোহাইব হযরত আবু বকর (রা.)কে অনুযোগের সুরে বললেন, আপনি আমাকে সাথে করে আনবেন বলেছিলেন, কিন্তু শেষে আমাকে একাকী ফেলে চলে এসেছেন। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও অনুযোগ দিয়ে বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাকে সাথে আনার কথা মনে করেননি। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়া থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলাম। যাই হোক, এখন আমার সমস্ত মাল কুরাইশদেরকে দিয়ে জান বাঁচিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়েছি। মক্কা থেকে মাত্র এক কেজি আটা সাথে এনেছিলাম। আবওয়াতে এসে তা খামির বনিয়ে রুটি তৈরি করেছি। ঐ রুটির দিয়ে এখন পর্যন্ত চলেছি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু ইয়াহইয়া (সোহাইবের ডাক নাম)! তুমি বড় লাভজনক ব্যবসা করেছো। আর তখনই এ আয়াত আল্লাহ পাক নাযিল করেন– 'মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য নিজের জানের ব্যবসা করে। আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি বড় দয়ালু।'

তারপর সোহাইব তার লাভজনক ব্যবসা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন। সত্যিকার মুসলমানেরা যেখানে সেখানে ইসলামের গর্ব করতো না। কারো প্রতি নিজের ইহসান প্রকাশ করতো না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রা.) মদীনায় হিজরত করার পর কুরাইশরা ভাবতে শুরু করলো, এই হিজরতের ফলে তাদের ভবিষ্যত

দিন দিন খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা অবশিষ্ট সাহাবীদের তালাশ করে তাদেরকে হিজরতে বাধা দিতে লাগলো এবং নানা প্রকার জুলুম-অত্যাচার করে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলো। সোহাইবকে তারা একা পেয়ে আবদ্ধ করেছিলো। আবু জাহেল ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছিলো, তুমি আমাদের এখানে নিঃসম্বল অবস্থায় এসেছিলে। মক্কাতে থেকে যথেষ্ট ধনোপার্জন করেছো। এখন আমাদেরকে ত্যাগ করে প্রচুর ধন-সম্পদসহ মুহাম্মদের নিকট যাচ্ছো, এটা কখনো হতে পারে না।

সোহাইব বলেছিলেন, আচ্ছা, আমার সমস্ত মাল-দৌলত তোমাদেরকে দিয়ে দিলে আমি কি হিজরত করতে পারবো?

কুরাইশরা বলে উঠলো, হ্যাঁ, তা করতে পারবে।

কিন্তু আবু জাহেল বললো, না না, তোমার মাল-দৌলতের চেয়ে তোমার শরীরটা আমাদের কাছে কম আবশ্যকীয় নয়। আমরা তোমাকে খুব শাস্তি দেবো। তোমার মাল-দৌলতও নেবো। নতুবা তুমি আমাদের ধর্মে ফিরে এসো।

সোহাইব দুঃখিত হয়ে বললো, আজ যদি আবদুল্লাহ বিন যুদান বেঁচে থাকতো, তোমরা কখনোই আমার সাথে এমন ব্যবহার করতে পারতে না।

আবু জাহেল বললো, আচ্ছা, আমরা তোমাকে আবদুল্লাহ বিন যুদানের নিকট পৌঁছে দিবো। তার কাছে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করো।

সোহাইব বললো, আফসোস! আমি তার সাথে সাক্ষাত করতে পারবো না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বেহেশতের ওয়াদা দিয়েছেন। আবদুল্লাহ বিন যুদান জাহান্নামে থাকবে।

এ কথা শুনে আবু জাহেল ক্রোধে আত্মহারা হয়ে সোহাইবের মুখে গুরুতর চপেটাঘাত করে তার সাথীদের বললো, হে তাইম বংশের লোকেরা! এ কমবখ্‌ত কি বলছে, তোমরা শুনছো? তোমাদের সরদার আবদুল্লাহ বিন যুদান জাহান্নামে যাবে, আর তার এই রুমী গোলাম সোহাইব বেহেশতে যাবে! এমন দৃষ্টতাপূর্ণ কথা আমি কখনো শুনিনি।

সোহাইব অনেক দিন মক্কাতে বন্দি ছিলেন। কোনমত জীবন বাঁচানো যায় এ পরিমাণ খানা খেতেন। এ সময় মক্কার অনেক গোলাম ও আজাদ লোক ইসলাম কবুল করেছিলো। তাদের সহযোগিতায় সোহাইব যিন্দানখানা থেকে বের হয়ে অল্প সময়ে যানবাহন সংগ্রহ করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কুরাইশরা যখন জানতে পারলো যে, সোহাইব বন্দিখানা থেকে বের হয়ে পলায়ন করেছে, তখন তাকে ধরার জন্যে কয়েকজন অশ্বারোহী তার পিছু নিলো। কিছুদূর চলার পর তারা সোহাইবকে দেখতে পেলো। এরা নিকটবর্তী হলে সোহাইব বললেন, হে কুরাইশরা! তোমরা জানো, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। খোদার কসম! আমার তূণীরের সমস্ত তীর নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ আমার কাছে আসতে পারবে না। তারপর তরবারী নিয়ে তোমাদের সাথে জীবনবাজি রেখে লড়বো এবং তরবারী ভেঙ্গে খান খান হওয়া পর্যন্ত তোমাদের হত্যা করতে থাকবো। তেমাদের জন্য দুটি পথ খোলা আছে। এ দু'টির যে কোন একটি তোমরা গ্রহণ করতে পারো। হয়তো আমার তরবারীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করবে, আর না হয় আমার মাল-দৌলতের সন্ধান নিয়ে আমার পথ ছেড়ে দিবে।

কুরাইশ আশ্বারোহীরা সোহাইবের মাল-দৌলত লাভে সম্মত হলো এবং বললো, তোমার প্রস্তাব কবুল করলাম। আমাদেরকে তোমার মাল-দৌলতের সন্ধান দাও।

সোহাইব তাদেরকে সম্পদের সন্ধান দিলে তারা সেখান থেকে ফিরে এলো। হযরত সোহাইব (রা.) ধন-সম্পদের বিনিময়ে মূল্যবান ঈমান নিয়ে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং দীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় কোবাতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন।

আঠারো.

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) ইতিহাসে ইবনে মাসউদ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য মুহাজিরদের মতো মদীনাতে হিজরত করে হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল কিংবা হযরত সাদ বিন খোযাইমার কাছে অবস্থান করতে লাগলেন। যতদিন পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে মুহাজিরদের জন্য আপন আপন গৃহাদি নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণ করে দেননি, ততদিন পর্যন্ত ইবনে মাসউদ তার মেজবানের ঘরে মুকীম ছিলেন।

কবিলা যুহরাদের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার মসজিদের পেছন দিকের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ কবিলার লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন ইবনে উম্মে আবদকে আমাদের কাছ থেকে পৃথক স্থানে দেন। তাদের মধ্যে ইবনে মাসুদের অবস্থান তারা পছন্দ করলো না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে আমি কাদের জন্য প্রেরিত হয়েছি? আল্লাহ তাআলা ঐ কওমকে কখনো সম্মানিত করেন না, যারা নিজেদের দুর্বল লোকদেরকে তাদের ন্যায্য হক না দেয়। তারপর

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি যুহরা গোত্রের মধ্যে সসম্মানে বসবাস করার জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করে দিলেন। ইবনে মাসউদ মদীনাতে বসতি স্থাপন করে হযরতের খাদেমগণের মধ্যে সামিল হলেন। তিনি সর্বদা হযরতের খেদমতে হাজির থাকতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্দর মহলে তাশরিফ নিলে তিনি বাইরে দারওয়ানী করতেন। নির্জনে ও মজলিসে সর্বাবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে তিনি হাজির থাকতেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশি উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইরে যেতেন তখন ইবনে মাসউদ লাঠি নিয়ে নবীজির আগে আগে চলতেন। হাদীসের রাবিগণের বর্ণনাতে পাওয়া যায়, ইবনে মাসউদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সফরের আসবাবপত্র, তার বিছানা, মেসওয়াক, জুতা ও অযুর পানি ইত্যাদির যিম্মাদার ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে কোন কথা গোপন রাখতেন না। এভাবে হযরতের অতি প্রিয় খাদেম হওয়ার সুবাদে অনেক সাহাবায়ে কেরাম ইবনে মাসউদকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের লোকই মনে করতেন।

ইবনে মাসউদ পবিত্র কুরআনের বড় হাফেজ ছিলেন। তিনিই হযরতের নিকট সব চেয়ে বেশি কুরআন শরীফ শুনতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর তিনি লোকদেরকে কুরআন তা'লিম দিতেন। কিন্তু হাদীস কম বর্ণনা করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বিষয়ে ইবনে মাসুদের মতকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করতেন। অধিকাংশ সময় তার প্রশংসা করতেন।

একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যদি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করে আমীর নির্বাচন করতাম, তাহলে ইবনে মাসউদকে নির্বাচন করতাম। অন্য একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদকে কোন এক গাছ থেকে ফল পেড়ে আনতে বললেন। তিনি গাছে উঠতে লাগলে তার ক্ষীণ পা দেখে সাহাবীগণ হাসলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা

হাসলে কেন?

সাহাবাগণ বললেন, হুজুর! আমরা ইবনে মাসুদের ক্ষীণ পা দেখে হেসেছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার ক্ষীণ পা-যুগল দেখে হাসছো? অথচ কিয়ামতের দিন মিযানে তার পায়ের ওজন ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী হবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত ইবনে মাসউদ তার খাদেম ছিলেন। হযরতের ওফাতের পর মুসলমানরা জিহাদের জন্য শাম দেশের দিকে যাত্রা করলে ইবনে মাসউদও এ দলে শরীক হলেন। কারণ, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবর্তমানে মদীনায় অবস্থান করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। তিনি অনেক দিন শামের অন্তর্গত হিম্‌স শহরে অবস্থান করেছিলেন। পরে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) তাকে কুফার মুআল্লিম করে সেখানে পাঠিয়ে ছিলেন।

উনিশ.

কুরাইশ বণিকদলের সরদার আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীদেরকে সসৈন্যে অতি সত্বর তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে মক্কায় ঘোষণা করে দেয়। কারণ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের তেজারতী কাফেলায় হামলা করার জন্য সাহাবীদের নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়েছেন– এমন সংবাদ শুনে কুরাইশরা অনেক ভয় পেয়ে যায়। প্রভাত থেকেই তারা লাড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে লাগলো। কুরাইশ সরদাররা এ যুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে অংশগ্রহণ করলো। আবু জাহেলের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, যে দুঃসময়ের কথা সে পূর্বেই ভেবেছিলো, তা সত্যই উপিস্থিত হয়েছে। সে জানে, কুরাইশরা শুধু তেজারতী কাফেলার সাহায্যের জন্যই বের হয়নি; বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সহাবীদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্যই বের হয়েছে।

কুরাইশরা যাত্রা করার পর পরই শুনতে পেলো, আবু সুফিয়ান সমুদ্র উপকূলের পথ ধরে নিরাপদে তার কাফেলা নিয়ে চলে আসছে। এখন তারা ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কুরাইশরা এভাবে ফিরে যেতে রাজি হলো না। শয়তান আবু জাহেলের মুখ দিয়ে বলতে লাগলো, আমরা বদর নামক জায়গা পর্যন্ত বিজয় নিশান উড়িয়ে যাবো। আরববাসীদের দেখাবো, কুরাইশদের আধিপত্য ও শান-শওকত এখনো বর্তমান আছে। সেখানে

গিয়ে উট জবাই করে ধুমধামের সাথে খাবো। অন্য আরবদেরকে আমাদের এ বিজয় উৎসবে দাওয়াত করে শরাব পান করাবো ও নাচ-গানের আনন্দ উপভোগ করাবো। মুহাম্মদ ও তার সাহাবীরা বুঝতে পারবে যে, এখনো হোবল দেবতার জয়ধ্বনি বুলন্দ আছে। আর কুরাইশদের ইজ্জত ও আধিপত্য কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।

সোহাইল বিন আমরও এ যুদ্ধে শরীক হয়েছে। সে তার সমস্ত ধন-সম্পদ তার পুত্র আবদুল্লাহর হাওলা করে তাকে আগে আগে যেতে বললো। আবদুল্লাহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলো। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর তার পিতা তাকে নানা প্রকার শাস্তি প্রদান করে ইসলাম ত্যাগ করার জন্যে বাধ্য করেছিলো। তার হাত-পা বেঁধে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলো এবং যতদিন পর্যন্ত তার পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি যে, তার পুত্র তাদের পুরাতন ধর্মে ফিরে এসেছে, ততদিন পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিচ্ছিলো। এ কারণে কুরাইশ সরদারগণের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার সময় সোহাইল তার পুত্র আবদুল্লাহকে বাহাদুরির সাথে সামনেই চলতে দিয়েছিলো। বদর ময়দানে এসে উভয় দল একে অপরের মুখোমুখি হলো। কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খুব অল্প সংখ্যক লোক দেখতে পেয়ে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের গর্বে ও বাহাদুরীতে ফুলে উঠলো।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনুমান করলেন যে, তাদের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই সকল প্রকার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তাই তিনি খুবই কাতরকণ্ঠে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন, মুসলমানদের অন্তরে সাহস ও দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্যে দুআ করলেন। অতঃপর উভয় দল খুবই নিকটবর্তী হলো। কুরাইশরা মুসলমান সেনাদলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে একটি আশ্চর্য ব্যাপার অনুভব করলো। মুসলমানরাও কুরাইশদের প্রতি নজর করে বিস্মিত হলো। কুরাইশরা দেখলো, এক সুস্থ ও বলিষ্ঠ যুবক তাদের দল ছেড়ে মুসলমানদের দলে মিলিত হওয়ার জন্যে যাচ্ছে। মুসলিম বাহিনী বিশেষ করে মুহাজিররা লক্ষ করলো, তাদের এক পরিচিত বন্ধু যাকে তারা প্রথমে খুব মুহাব্বত করতো, পরে কুরাইশদের মতো তাদেরও বিশ্বাস হয়েছিলো যে, সে পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে গেছে। তার

জন্য খুব অনুতাপ ও আফসোস করতো। সে তাদের দিকে দৌড়ে আসছে।

কুরাইশরা এ ব্যাপার দেখে ব্যস্ত হয়ে এ যুবক সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করতে লাগলো। অধিকাংশ মুসলমান ঐ যুবক সম্পর্কে ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। উভয় দল এখন বুঝতে পারলো, এ যুবক আবদুল্লাহ বিন সোহাইল। যে এতদিন কুরাইশ মুশরেকদেরকে ধোকা দিয়ে রেখেছিলো এবং আম্মার বিন ইয়াসির সম্পর্কে আল্লাহর যে বাণী নাযিল হয়েছে তার ফায়দা হাসিল করেছিলো।

প্রকৃতপক্ষে সে কুফুরী ধর্ম গ্রহণ করেনি। কুরাইশদের জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য আম্মারের মতো নিজের অন্তরে ঈমান গেঁথে নিজ কওম থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হলো এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করে দু'আ প্রার্থনা করলো। পরে মুহাজির বন্ধুদের সঙ্গে কুরাইশদের বিপক্ষে– যেখানে তার পিতাও রয়েছে– যুদ্ধ করতে দাঁড়ালো। যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার সময় আবদুল্লাহ তার ভগ্নিপতি আবু হোযাইফা বিন উতবার সাক্ষাত পেয়ে তার নিকট নিজের অবস্থা বয়ান করলো। আবু হোযাইফা বললো, ভাই! খুব ভাল করেছো।

ধীরে ধীরে উভয়ে নিকটবর্তী হতে লাগলো। এমন সময় কুরাইশ ও মুসলমান আরেক ঘটনা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। সকলে দেখলো, এক যুবক উভয় দলের মধ্যবর্তী স্থানে এসে কুরাইশ সেনাপতি উতবা বিন রাবীয়াকে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে। উতবাও এ যুবকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করতে বের হলো। কিন্তু যুবককে দেখে তৎক্ষণাত ফিরে গেলো। এ অভূতপূর্ব ও অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখে কুরাইশরা ক্রোধে অধীর হলো। মুসলমানরাও হয়রান হলো। দেখা গেলো, ঐ আহ্বানকারী যুবক আবু হোযাইফা তার পিতাকে যুদ্ধের জন্য ডাকছে। উতবা নিজ পুত্র আবু হোযাইফাকে দেখে ফিরে গেলো।

যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা (উতবার কন্যা) জানতে পারলো, তার পিতা উতবা, তার ভাই আদিল ও চাচা শায়বা সকলেই নিহত হয়েছে। আর তার ভাই আবু হোযাইফা আপন পিতাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছিলো। হিন্দা তার ভাই আবু হোযাইফাকে খুব গালি-গালাজ করেছিলো।

এ যুদ্ধে মুহাজিরদের সাথে আবদুল্লাহ বিন মাসউদও ছিলেন। তিনি ক্ষীণদেহের অধিকারী হলেও অতি ক্ষিপ্রহস্ত চতুর ও কর্মঠ লোক ছিলেন। মক্কায় অবস্থানকালেও তিনি বেশ ক্ষিপ্রতার সাথে ইসলাম প্রচার করতেন। কুরাইশরাও কোনভাবে তাকে কাবু করতে পারতো না। এ যুদ্ধেও তিনি তেমন ক্ষিপ্রতার সাথে কুরাইশদের ব্যূহ ভেদ করে সর্বস্থানে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদলকে বিচলিত করে তুলেছিলেন। তিনি দেখলেন, আফরার দুই পুত্র আবু জাহেলকে ভূপাতিত করে হত্যা করছে। ইবনে মাসউদ তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখলেন, আবু জাহেল এখনো মরেনি, অস্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে। তিনি লাফ দিয়ে তার বুকের উপর বসে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ তোমাকে অবশেষে লাঞ্ছিত করেছেন।

আবু জাহেল মৃতপ্রায় কণ্ঠে থেমে থেমে বললো, ওহ্! তুমি ঐ রাখাল বালক! তুমি তো বেশ উঁচু জায়গায় বসেছো!

ইবনে মাসউদ বললেন, হ্যাঁ, এখন দুনিয়ার শাস্তি ভোগ করো। আখেরাতের কঠোর আজাব পরে আসছে।

তারপর ইবেন মাসউদ আবু জাহেলের শিরোশ্ছেদ করে তাড়াতাড়ি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এ সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! ইবনে মাসউদও তা-ই বললেন। পরে সমস্ত মুসলমান নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললো। মুসলমানদের পক্ষে মাত্র তিন জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করলেন। যুদ্ধ শেষে কুরাইশদের মৃতদেহগুলো এক পুরাতন কূপে নিক্ষেপ করা হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত কাফেরদের উদ্দেশে বললেন, হে কূপবাসী! তোমরা আল্লাহর ওয়াদা সত্য পেয়েছো কি? আমার সাথে আল্লাহর ওয়াদা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

কোনো কোনো সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা তো মৃতদেহমাত্র!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এরা তোমাদের মতই শুনছে, তবে উত্তর দিতে পারছে না মাত্র।

বিশ.

হযরত বেলাল ঐ সকল দৃঢ়পদ ও দৃঢ়প্রত্যয়ী মুসলমানদের একজন যারা সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছেন। তিনিই হলেন মুসলমানদের সর্বপ্রথম মুআজ্জিন। মুসলমানদের মধ্যে জামাতে নামায পড়ার ইন্তেজাম হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুআজ্জিন নিযুক্ত করেন। অবশ্য তখন আরবে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে হযরত বেলালের চেয়ে সুস্পষ্ট ও বুলন্দ আওয়াজ বিশিষ্ট সুবক্তা আরো অনেকে ছিলেন। কিন্তু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রা.)-এর পূর্বে এমন অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় বিপজ্জনক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তিতা ও অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেও ঈমান আকিদা বজায় রাখার বিষয়ে অবগত ছিলেন। এজন্য তাকে সর্বপ্রথম মুআজ্জিনের মর্যাদা দান করেছেন। হযরত বেলাল (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে হযরত আবু মাখদুম আযান দিতেন। তাঁরা দু'জন অনুপস্থিত থাকলে হযরত উমর বিন উম্মে মাকতুম আযান দিতেন। হযরত বেলাল (রা.) একনিষ্ঠভাবে যথাসময়ে আযান দিতেন, কখনো সামান্য সময়ও বিলম্ব করতেন না। তিনি আযান শেষ করে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে 'হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, আস্ সালাতু ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে হুজুরের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তারপর দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে তাশরিফ আনলে বেলাল (রা.) একামত বলতেন। দুই ঈদ ও ইস্তেসকার নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগে আগে যেতেন। ঈদগাহে পৌঁছে বেলাল (রা.) একটি বর্শা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে গেড়ে দিতেন। তিনি সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। তিনি বেলালকে অত্যন্ত মুহাব্বত করতেন এবং তার ইজ্জত করতে কখনো কসুর করতেন না। এর দ্বারা তিনি এটাই ইঙ্গিত করতেন, যেন অন্যরাও হযরত বেলালকে সম্মান করেন এবং তাঁর ইজ্জত কদর যথারীতি বজায় থাকে।

একদিন এক আরব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অন্য এক আরবের সাথে তার মেয়ে বিবাহ দেয়ার জন্য দরখাস্ত করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বেলালের সাথে তোমার মেয়ে বিবাহ দাও না কেন?

ঐদিন লোকটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার কোন জবাব না দিয়ে চলে গেলো। দ্বিতীয় দিন লোকটি হুজুরের দরবারে উপস্থিত হয়ে একই আরজি পেশ করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে আগের দিনের সে কথাই বললেন, তুমি বেলালের সাথে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও না কেন? সেদিনও লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে ফিরে গেলো।

লোকটা আবার অন্যদিন এসে তার আরজি পুনরায় পেশ করলো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের মতো ঐ কথারই জবাব দিলেন, তুমি বেলালের সাথে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও না কেনো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলালের মরতবা আরো বাড়িয়ে বললেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছে, তার সাথে মেয়ের বিয়ে দিবে না কেনো? এজন্য সকলে হযরত বেলাল (রা.)কে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন কদর করতেন তেমনি কদর করতেন।

হযরত আম্মার (রা.) বলতেন, আমাদের ভক্তিজ্ঞানের সরদার হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের অন্য ভক্তিভাজন সরদার বেলালকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করেছেন। এমনতর ইজ্জত-কদরের কথায় হযরত বেলালের মনে কখনো আত্মশ্লাঘা বা অহংকার ভাব উদয় হতো না। তিনি হামেশা এত বিনয়ী ছিলেন, যেন মাটির মানুষ।

একবার তিনি আযান দিতে যাচ্ছেন। তখন তার মনে সামান্য অহংকার

ভাবের উদয় হলে অনুতাপের ভাবোচ্ছ্বাসে কবিতার আকারে কতগুলি কথা বলেছিলেন। সেগুলো ঠিক ছন্দ না হলেও ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে।

'বেলালের কী হলো–
তার মা তার জন্যে কাঁদতে থাকুক,
তার কপাল রক্তবিন্দুতে সিক্ত হোক!'

লোকেরা বেলালের নিকট তার গুণ-গান করলে তিনি উত্তরে বলতেন, আমি একজন হাবশী বান্দা। গতকাল পর্যন্ত দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ ছিলাম।

মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমানদের বিজয় উৎসবে মক্কাতে প্রবেশ করলে কুরাইশরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলো। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুষ্ট ও দুর্বৃত্ত লোকদের ক্ষমা করে ঐ কথাগুলো বলেছিলেন, যা হযরত ইউসুফ (আ.) আপন ভাইদেরকে বলেছিলেন– আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই! আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি অতি দয়াবান। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ থেকে সপ্তমূর্তি ভেঙ্গে ফেলে আল্লাহর পবিত্র ঘরকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য উন্মুক্ত করলেন। তারপর তিনি বেলালকে বললেন, যাও বেলাল! তুমি খানায়ে কাবার ছাদের উপর ওঠে আযান দাও।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ অনুযায়ী বেলাল আল্লাহ তাআলার গৌরবময় একত্বের বাণী আল্লাহু আকবার বলে উঁচু সুরে আযান দিলেন। এ সময় হারেস বিন হিশাম, সাফওয়ান বিন উমাইয়া এ দৃশ্য দেখছিলেন। হারেস মনে মনে বলতে লাগলো, আজ যদি আমার ভাই আবু জাহেল জীবিত থাকতো, তবে বেলালকে কাবার ছাদে দাঁড়ানো দেখে কী ভাবতো? সাফওয়ান বিন উমাইয়া মনে মনে বললো, আমার পিতা উমাইয়া বিন খালফ, যিনি এ বেলালকে বহুদিন শাস্তি দিয়েছিলো– আজ তাকে কাবাঘরের ছাদে দেখে কী যে বলতো! শুধু তাই নয়, তারা আরো দেখলো কাবাঘর থেকে হোবল দেবতার মূর্তি ভেঙ্গে দূরে ফেলে দেয়া হয়েছে। তদ্রুপ লাত-ওজ্জা-মানাত প্রভৃতি সকল মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দূরে ফেলে দেয়া হয়েছে। আর কাবাঘরের উপর এক হাবশী বংশীয় লোক মুহাম্মদের ধর্মের বিজয় ঘোষণা ঐ সকল লোকের মধ্যে করছে, যারা মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের সাথে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করে আসছে। কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়–

মুহাম্মদের ধর্ম অবলম্বন না করে কারো উপায় নেই। এমন অভাবনীয় দৃশ্য দেখে উভয় ব্যক্তি একে অপরকে চুপে চুপে বলতে লাগলো– তুমি কি ঐ হাবশীকে দেখতে পাচ্ছ না? অপরজন বিরক্তিমাখা কণ্ঠে ক্ষীণ আওয়াজে বললো, যদি এই অবস্থা আল্লাহর অপছন্দ হয়, তাহলে তিনি নিজেই এর পরিবর্তন ঘটাবেন।

তারা এ জাতীয় কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলো। অন্যদিকে বেলাল (রা.) কাবার ছাদে দাঁড়িয়ে উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করতে লাগলেন– 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।'

অনেকদিন পর হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় হযরত বেলাল (রা.) মদীনা শরীফে আযান দিচ্ছিলেন। যখন তিনি দুঃখভারাক্রান্ত সুরে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল' তখন সমস্ত লোকের মধ্যে কান্নার রোল উঠলো। মসজিদে গুম গুম শব্দ হতে লাগলো– তখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদন মুবারক দাফন করা হয়নি। হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাফনের কাজ সমাধা করার পর হযরত বেলাল দাঁড়িয়ে খলীফার নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! যদি আপনি আমাকে নিজের সাথে রাখার জন্যে খরিদ করে থাকেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনার কাছে রাখতে পারেন। আর যদি আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে আজাদ করে থাকেন, তবে আমাকে আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিন।

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, বেলাল তুমি কী চাও?

বেলাল (রা.) বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করাই মুসলমানের সর্বোত্তম আমল। এজন্য আমি চাচ্ছি, আপনি আমাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দেন।

হযরত আবু বকর (রা.) বেলাল (রা.)কে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বহু চেষ্টা করেও সফল হননি। অতঃপর বেলাল (রা.) খলীফাতুল মুসলিমীনের অনুমতিক্রমে শাম দেশে জেহাদে চলে গেলেন এবং অত্যন্ত তৎপরতার সাথে জেহাদে নিয়োজিত ছিলেন। অবশেষে বিশ হিজরীতে তিনি শামদেশে ইন্তেকাল করেন।

একুশ.

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসে মুবাশ্বির বিন আবদুল মুনযিরের মেহমান হলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোযাইফা বিন ইয়ামানের সাথে আম্মারের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মারের জন্য একখণ্ড জমি নির্দিষ্ট করে দেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি মুবাশ্বিরের ঘরেই ছিলেন। জমি পেয়ে তিনি নিজের ঘর তৈরি করে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মারকে অত্যন্ত মুহাব্বত ও স্নেহ করতেন। হযরত আম্মারেরও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্নেহ ও মুহাব্বতের পূর্ণ অনুভূতি ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্নেহ ও মুহাব্বতের বদৌলতে আম্মার ধর্মের উপর পর্বতের মতো অটল ছিলেন। অধিকাংশ মুসলমানের তুলনায় তার বিশিষ্টতা এখানেই ছিলো। সকল মুসলমানই তাকে সম্মানের চোখে দেখতেন। তার ধর্মনিষ্ঠা ও মজবুত ঈমান সাধারণ লোকদের আলোচনার বিষয় ছিলো। ইসলামের খেদমতের জন্য আল্লাহর রাস্তায় হযরত আম্মার অন্য মুসলমান থেকে বেশি কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করেছেন।

হিজরতের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর

ভিত্তি স্থাপন করলেন। তখন সকল মুসলমানই এ পবিত্র কাজে অংশগ্রহণ করে সওয়াব হাসিল করাকে পরম সৌভাগ্য মনে করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ নির্মাণ কাজে অন্যদের তুলনায় কোন অংশে কম কাজ করেননি। তিনি অন্য সবার মতো ইট-পাথর সংগ্রহ করে এনেছেন। তাঁর চেহারা মুবারকে ইটের ধুলা লেগে যেতো। যেখানে অন্য মুসলমানরা একটি ইট আনতো, হযরত আম্মার দুইটি ইট আনতেন। এতে তিনি অন্তরের সন্তুষ্টি লাভ করতেন। খাঁটি মুসলমানরা আম্মারের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু মুনাফিকরা তার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতো। ইট আনতে আনতে হযরত আম্মার মুখে বলতে থাকতেন, আমরা মুসলমানরা মসজিদ বানাচ্ছি। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের উৎসাহ বাড়াতে আম্মারের কথায় সায় দিয়ে বলতেন, হ্যাঁ, মসজিদ বানাচ্ছি। কখনো কখনো তিনি আম্মারের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে অতি আদরের সাথে তার গায়ের ধূলোবালি ঝেড়ে দিতেন। একদিন ঐরূপ আম্মারের গায়ের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আফসোস আম্মার! একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।

সকল মুসলমানের অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী অংকিত হয়ে থাকলো এবং আম্মারের ইজ্জত ও মহত্ত্ব বেড়ে গেলো। আম্মারের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ভবিষ্যদ্বাণী কয়েকবার করেছেন। প্রথমবার মসজিদে নববী নির্মাণের সময়, দ্বিতীয়বার খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করার সময়। মসজিদ নির্মাণের কাজে আম্মার যেমন পরিশ্রম করেছিলেন, খন্দক খননকালেও তিনি অন্য মুসলমান থেকে দ্বিগুণ তিনগুণ মেহনত করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ খনন কাজে সকল মুসলমানের সাথে থেকে থেকে কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন। তিনি পাথর ও মাটি কাঁধে তোলার সময় নিম্নলিখিত উৎসাহমূলক পদাবলী উচ্চারণ করতেন–

ইয়া আল্লাহ! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন।
আয় আল্লাহ! আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খননকাজে লিপ্ত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে আরয করলো, হুজুর! আম্মারের উপর দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে সে মারা গেছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আম্মার মরেনি। তারপর তিনি আম্মারকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জীবিত দেখে বললেন, আফসোস আম্মার! তোমাকে একদল বিদ্রোহী লোক কতল করবে।

একথা শুনে আম্মারের ঈমান একীন আরো মজবুত হলো এবং যথাসম্ভব নেক কাজ করার জন্য তার উৎসাহ বেড়ে গেলো। তিনি যথাসাধ্য ফেতনা-ফাসাদ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। কথাও কম বলতে আরম্ভ করলেন। নিতান্ত আবশ্যক না হলে কথা বলতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি নীরবতা ভঙ্গ করলে বলতেন, ফেতনা-ফাসাদ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে আবার দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করতেন।

হযরত খালিদ বিন অলিদ ইসলাম গ্রহণের পর একদিন হযরত আম্মারের নিকট আসলেন। কথায় কথায় উভয়ের মধ্যে কিছু বাদ-প্রতিবাদ হলে হযরত খালিদ কঠোর সুরে বললেন, সুমাইয়া আমার চাচা আবু হোযাইফার বাঁদী ছিলো এবং ইয়াসির আমার চাচার হলিফ ছিলো ইত্যাদি। তিনি এটাই বলতে চাইলেন যে, আম্মার তার চাচা আবু হোযাইফার আযাদকৃত গোলাম। প্রকৃতপক্ষে হযরত খালিদের অন্তরে বনি মাখযুম গোত্রের বড়াই ও কুরাইশ বংশের গরীমা তখনও বর্তমান ছিলো।

হযরত আম্মার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে হযরত খালিদের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে অভিযোগ করলেন। ঠিক সে সময় হযরত খালিদও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং হযরত আম্মারের সাথে কর্কশ ও কঠোর ভাষায় কথা বললেন। হযরত আম্মার নীরব থাকলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। কতক্ষণ পর মাথা উঁচু করে খুবই কোমল কণ্ঠে বললেন, যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে শত্রুতা করে সে যেন আমার সাথে শত্রুতা করে। এ কথায় আম্মার সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়লেন। কিন্তু হযরত খালিদ লজ্জিত ও মর্মাহত এবং দাসভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন। তিনি হযরত আম্মারকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেলেন না।

বাইশ.

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর আরবের বেশ কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গেলো। খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) সকল আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে আরববাসীকে পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। হযরত খালিদ বিন অলিদ মুজাহিদদের নিয়ে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার ভণ্ড মুসায়লাম কায্যাবকে দমন করার জন্য এবং বনি হানিস গোত্রের লোকদের পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনার জন্য ইয়ামামার দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে মুসলমান ও মুরতাদদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে চারজন সাহাবী এমন ছিলেন, যারা বদর ওহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলেন।

সেই চারজন হলেন– হযরত আম্মার বিন ইয়াসির, হযরত আবু হোযাইফা বিন উতবা বিন রাবিআ ও তার আযাদকৃত গোলাম সালেম বিন সালেম– যিনি আবু হোযাইফার পুত্র হিসাবেও পরিচিত ছিলেন এবং আবদুল্লাহ বিন সোহাইল বিন আমর। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। কিন্তু উল্লিখিত চার যোদ্ধা পাহাড়ের মত দৃঢ়পদ থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন।

হযরত সালেম বলিষ্ঠকণ্ঠে বলতে লাগলেন, মুসলিম ভাইয়েরা! আফসোস, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থেকে আমরা এভাবে যুদ্ধ করিনি। তারপর তিনি একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে পা রেখে

দাঁড়ালেন। হযরত আবু হোযাইফা ও আবদুল্লাহ বিন সোহাইলও তার অনুকরণে গর্ত খুঁড়ে তাতে পদযুগল আটকে দাঁড়ালেন। এভাবে এ তিন মহাপুরুষ প্রাণপণে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করলেন।

হযরত আম্মার একটি বড় পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার একটি কান কেটে মাটিতে পড়ে গেলো। তবু তিনি অসাধারণ বীরত্বের সাথে মুসলমান যোদ্ধাদের উৎসাহিত করে ডাকছিলেন, মুসলমানেরা! আমার দিকে আস। আমি ইয়াসিরের পুত্র আম্মার। তোমরা কি বেহেশত থেকে দূরে পালাচ্ছ? এভাবে তিনি ঐ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে মুসলমান যোদ্ধাদের সিংহ-গর্জনের ন্যায় ডাকতে লাগলেন। তার এ গর্জন মানুষের অন্তরে জাদুর মতো কাজ করলো এবং ধীরে ধীরে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলো। আল্লাহর সাহায্য তাদের জন্য অবতীর্ণ হলো এবং তারা যুদ্ধে জয় লাভ করলো।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত সালেমের শাহাদাতের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি সালেমের ত্যাজ্য মাল-সম্পদ তার আজাদকারিনী হযরত সুবাইতা বিনতে ইয়ার আনসারীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সুবাইতা এই বলে এ সমস্ত মালপত্র প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমি সালেমকে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে আজাদ করেছি, মাল-দৌলতের উদ্দেশে আজাদ করিনি।

তারপর হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে হযরত সালেমের পরিত্যক্ত সম্পদ পুনরায় হযরত সুবাইতার নিকট পাঠানো হয়েছিলো। এবারও তিনি ঐ একই কথা বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর ঐ সম্পদ সরকারী বাইতুল মালে জমা হলো।

হযরত আবু বকর (রা.) যখন হজ করতে গিয়েছিলেন তখন মক্কাতে সুহাইল বিন আমরের সাথে দেখা হলে তিনি সোহাইলের জ্যৈষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুশোক নিবারণার্থে তাকে সান্ত্বনা জানালেন। হযরত সোহাইল বললেন, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, শহীদগণ আখেরাতে নিজ বংশের ৭০ জনের জন্য সুপারিশ করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার পুত্র সবার আগে আমার জন্যই সুপারিশ করবে।

তেইশ.

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হয়েছিলেন। তারপর হযরত উমর (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই পূর্ব থেকে যে সকল বিজয়াভিযান শুরু হয়েছিলো তাতে মনোনিবেশ করলেন। তিনি ঐ সকল অভিযানে কোন প্রকার দুর্বলতা ও শিথিলতা প্রকাশ করেননি। তাছাড়া তার সুদৃঢ় ও সুষ্ঠু পরিচালনায় সকল অভিযানেই জয়লাভ হয়েছিলো এবং প্রভাব প্রতিপত্তি চারদিকে বিস্তৃত হলো। তিনি সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকতেন। তিনি আরবের সর্বসাধারণ ও কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য– যারা শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বদর ও ওহুদ যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ পাননি, তারা রোম পারস্য ও অন্যান্য দেশ বিজয় অভিযানে স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে অনেক সওয়াব হাসিল করতে পারেন। বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের জন্য এ সওয়াব অর্জনের পথ উন্মুক্ত। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.) যখন আরববাসীদেরকে যুদ্ধের ময়দানে বের করলেন, তারা বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের ন্যায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরাও পরবর্তী মুসলমান থেকে এ সকল যুদ্ধে কোন অংশে কম করেননি। হযরত উমর

তাদেরকে বাধা দেননি। অবশ্য কুরাইশ বংশের বিশেষ কিছু লোককে মদীনাতেই রেখে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে এ সকল লোককে বিদেশে পাঠালে তাদের স্বভাবগত বংশ-গৌরব ও মর্যাদাবোধ তাদের কর্তব্য পালনে অন্ত রায় হতে পারে। তাই অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তারা কখনো যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে তাদের বলা হতো, আপনারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে অনেক যুদ্ধ করেছেন। সেটাই আপনাদের জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে গরীব কুরাইশ ও অন্য সাহাবাগণ সম্পর্কে তার কোনো ধরনের সন্দেহ ছিলো না। তাই তাদেরকে যুদ্ধে যোগদানের অবাধ অনুমতি দিলেন।

এভাবে হযরত বেলাল, হযরত আবু জর, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) শাম দেশের দিকে যুদ্ধে গেলেন। অন্যরা ইরাকের দিকে রওয়ানা হলেন। কেবল দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক এবং যাদেরকে হযরত উমরের নিকট দূরদর্শী রাজনীতিক বিবেচনায় বিদেশে পাঠানো সমীচীন মনে হয়নি, তারাই মদীনাতে থাকলেন। হযরত উমর (রা.)-এর নিকট একজন খুব আশান্বিত হয়ে ইরাকগামী সেনাদলে যোগদানের অনুমতি চাইলেন। খলীফা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ডেকে কাছে বসালেন। বললেন, সমস্ত লোকের মধ্যে কেবল একজন ব্যতীত এ সম্মান লাভের অধিকতর হকদার আর কেউ নেই।

হযরত খাব্বাব আরজ করলেন, আমীরুল মুমিনীন! সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে?

খলীফা উত্তর করলেন, ঐ ব্যক্তি বেলাল।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, খলীফা এ স্থলে হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের নাম উল্লেখ করেছিলেন।

হযরত খাব্বাব নিবেদন করলেন, না হুজুর, তিনি আমার চেয়ে বেশি হকদার নন। কারণ, কুরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাকে রক্ষা ও সাহায্য করার কিছু লোক ছিলো। কিন্তু আমার কোনো সহায় ছিলো না। একদিন কুরাইশরা আমাকে ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চিত করে শুইয়ে রাখলো। এক ব্যক্তি তার পা দিয়ে এমনভাবে আমাকে চেপে ধরলো, যেনো আমি নড়াচড়াও করতে না পারি। খোদার কসম! আমার পিঠের চাপে ঐ আগুন নিভে গিয়েছিলো। তারপর তিনি গায়ের চাদর সরিয়ে পিঠে আগুনে পোড়ার দাগ দেখালেন।

হযরত উমর (রা.) ও উপস্থিত লোকেরা তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। তার পিঠে শ্বেত-কুষ্ঠের মতো আগুনে পোড়ার দাগ বিদ্যমান ছিলো। এমন দুঃখ-যাতনা সহ্য করেও তিনি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বদর ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপরও তিনি প্রায় সকল যুদ্ধে শরীক থাকতেন। তবুও তিনি মনে করতেন, আল্লাহর রাস্তায় দীন-ধর্ম প্রচারের জন্য যতটা দুঃখ-যাতনা মানুষের সহ্য করা উচিত তা তিনি পূর্ণরূপে আদায় করতে পারেননি। তিনি ইরাকগামী বাহিনীতে যোগ দিয়ে জেহাদ করেছিলেন।

তারপর তিনি কুফাতে বসবাস করতে লাগলেন। শেষ জীবনে তিনি জ্বর ও বার্ধক্যজনিত কারণে রোগাক্রান্ত হলে কয়েক জন সাহাবী তাকে দেখতে এসেছিলেন। তখন তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তিনি তাদেরকে বললেন, যদি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি এ সময় মৃত্যু কামনা করতাম। এই বলে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। তার চোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রুবিন্দু ঝরতে লাগলো।

সাহাবায়ে কেরাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আবু আবদুল্লাহ! আপনি পূর্বগামীদের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। সুতরাং আপনার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

এটা শুনে তিনি আরো কাঁদতে লাগলেন। বললেন, আমার এ কান্না অধৈর্য বা ভয়ের কারণে নয়; বরং যেসব ভাইয়ের কথা আপনারা বললেন, তারা নিজ নিজ সওয়াব সাথে নিয়ে গেছেন। আমার ভয় হচ্ছে, যেসব নেক কাজের কথা আপনারা উল্লেখ করলেন, তার সওয়াব এ দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ামত ও সুখ-শান্তি হিসাবে ভোগ করে নিলাম কি না! তবে যে আখেরাতে খালি হাতে যাব!

আবার তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। সকলে মনে করলো তার মৃত্যু হয়েছে। ফলে কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে দেখলেন তার কাফন আনা হয়েছে। কাফন দেখে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত হামযা (রা.)কে এমন সংকীর্ণ চাদর দ্বারা কাফন দিতে হয়েছিলো যে, তার পা ঢাকলে মাথা খুলে যেতো, মাথা ঢাকলে পা খুলে যেতো। অবশেষে মাথা ঢেকে পা ইজখির ঘাস দ্বারা আবৃত করা হয়েছিলো।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমার নিকট একটি কড়িও ছিলো না। এখন দেখুন, ঘরের কোণে সিন্ধুকের মধ্যে ৬৬৬৬ দেরহাম মজুদ। অমূল্য নেয়ামত দুনিয়াতে আমাকে অগ্রিম দেয়া হলো কি না?

সাহাবাগণ প্রত্যাবর্তনকালে পরস্পর আলোচনা করতে লাগলেন, হযরত খাব্বাব কত অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে ধর্মীয় জীবন-যাপন করেছেন ও কত নেকীপূর্ণ সঞ্চয় করেছেন! তবুও তিনি আল্লাহর দরবারে শূন্য হাতে যাচ্ছেন বলে ভয় করছেন। একজন বললেন, এতে সন্দেহ কি? আপনি কি জানেন না, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন স্ত্রী লোককে কী বলেছিলেন? ঐ স্ত্রীলোকটি হযরত উসমান বিন মাযউনের মৃত্যুতে একথা বলেছিলো– আল্লাহ্ পাক উসমানকে প্রচুর সম্পদ দান করেছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বলেছিলেন, তুমি কীভাবে জানো যে, আল্লাহ পাক উসমানকে সম্মানিত করেছেন! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও সঠিক জানি না যে আমার অবস্থা কী হবে!

গুরুতর রোগ-যন্ত্রণায়ও আল্লাহর সাথে মোলাকাতের ভয়ে অস্থির থেকেও হযরত খাব্বাব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে নসীহত ও শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তদানীন্তনকালে লোকেরা আপন পরিজনের মৃতদেহ নিজ বাড়ি-ঘরেই দাফন করতো। হযরত খাব্বাব আপন মৃত্যু নিকটবর্তী বুঝতে পেরে তার পুত্রকে অসিয়ত করলেন– প্রিয় পুত্র! আমার মৃত্যু হলে লাশ শহরের বাইরে দাফন করো। কারণ, লোকেরা যখন দেখবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক সাহাবীকে শহরের বাইরে দাফন করা হয়েছে, তখন তারাও তাদের লাশগুলো শহর থেকে দূরবর্তী স্থানে দাফন করতে আরম্ভ করবে।

হযরত খাব্বাবের ইন্তেকাল হলে হযরত আলী (রা.) তার জানাযা পড়ান এবং তার অসিয়ত অনুযায়ী কুফা শহরের বাইরে তাকে দাফন করা হয়েছে। অতঃপর অন্যরাও লাশ এনে তার কবরের নিকট দাফন করতে আরম্ভ করে।

চব্বিশ.

হযরত সোহাইব (রা.) ইসলাম গ্রহণের পরও পূর্বের ন্যায় দান-সদকা করতেন। ইসলামের বহু ধর্মযুদ্ধে বিজয়ের পর গনিমতের মাল ও ধনাগমনের সাথে সাথে তার দান-খয়রাত বেড়ে গেলো। তার দানশীলতা ও বদান্যতার সুখ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে গেলো। তার দস্তরখানায় মেহমানের ভিড় ব্যতীত একটি রাতও অতিবাহিত হতো না। দেশের সর্বত্রই আবু ইয়াহইয়ার দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার কথা আলোচিত হতো। খলীফা হযরত উমর (রা.) তার যশ-খ্যাতির কথা শুনে একদিন লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই আবু ইয়াহইয়া কে, লোকেরা যার ভূয়সী প্রশংসা করছে?

লোকেরা বললো, তিনি হলেন হযরত সোহাইব।

হযরত উমর (রা.) একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন, সোহাইবের কি কোন ছেলে আছে, যার কারণে তাকে আবু ইয়াহইয়া বলা হয়?

লোকেরা বললো, না, তার কোন পুত্র নেই। এমনি সকলে তাকে ডাকনাম হিসাবে আবু ইয়াহইয়া ডাকে। তিনি নিজে আরব-বংশের দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকেন।

হযরত উমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, সোহাইব কি আরব-বংশীয় লোক?

লোকেরা বললেন, তিনি তো তাই বলে থাকেন।

একদিন হযরত উমর (রা.), হযরত সোহাইব ও অন্য লোকজন মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা সোহাইবকে ডেকে বললেন, সোহাইব! আমি তোমাকে তিনটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। প্রথমত ইয়াহইয়া নামে তোমার কোনো পুত্র নেই। তবুও তুমি আবু ইয়াহইয়া নামে নিজের পরিচয় দাও কেন? দ্বিতীয়ত তুমি একজন রোমান লোক হয়েও নিজেকে আরবীয় বলে পরিচয় দাও কেন? তৃতীয়ত, তুমি এত অধিক অতিথিসেবা করো কেন– যা অপচয় বলে মনে হয়?

হযরত সোহাইব উত্তর করলেন, আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে– রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কুনিয়ত আবু ইয়াহইয়া রেখেছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– আমি আরবের সোসেল প্রদেশবাসী নজর বিন কাসেদ-এর বংশধর। রুমীরা আমাকে বাল্যকালে ধরে নিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো। তখনও আমি নিজ গোত্র ও দেশ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম। তৃতীয়ত অতিথিপরায়ণতা আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীসের উপর আমল করছি– 'তোমাদের মধ্যে যে লোকজনকে খানাপিনা দেয় ও সালামের জবাব দেয়, সেই সর্বোত্তম।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ ফরমানই আমাকে অতিথিসেবার প্রতি প্ররোচিত করেছে।

সোহাইবের এ উত্তর শুনে হযরত উমর (রা.) চুপ হয়ে গেলেন। হযরত সোহাইব একজন আদর্শ মুসলমান ছিলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীস ছিলো তার জীবনের আদর্শ– 'ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান, যার হাত ও রসনা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।' হযরত সোহাইব আল্লাহর বান্দাগণের দীন-দুনিয়ার বহু উপকার করে গেছেন। তার জ্ঞান ও দৌলত দুটোই লোকজনের জন্য উৎসর্গ ছিলো। ভুল-ত্রুটির ভয়ে তিনি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস কমই রেওয়ায়েত করেছেন। কেউ তাকে হাদীস বর্ণনা করতে অনুরোধ করলে তিনি বলতেন, আমি যেসব যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম তার বর্ণনা

করতে পারি। হাদীস বর্ণনা করতে আমার ভয় হয়।

হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতের সময় হযরত সোহাইব অতি দানশীল, উদার ও শান্তিপ্রিয় মুহাজির নাগরিক হিসাবে মদীনাতে জীবন-যাপন করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) যখন জনৈক ঘাতক কর্তৃক আহত হয়ে মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পারলেন, তখন এক পরামর্শ-সভা ডেকে তাদের উপর মুসলমানদের খলীফা নির্বাচনের ভার অর্পণ করলেন এবং খলীফা নির্বাচন পর্যন্ত হযরত সোহাইবকে তিন দিন মুসলমানদের ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। মুহাজির ও আনসার সকলেই দেখলেন, হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশ মতে হযরত সোহাইব ইমামতি করছেন। পরামর্শ-সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের নেতা ও ইমাম ছিলেন। পরে হযরত উমর (রা.)-এর ইন্তেকাল হলে লোকেরা তার জানাযার নামাযের ইমামতিও হযরত সোহাইবকে করতে দিলেন।

মুহাজির ও আনসার কেউ হযরত সোহাইবের ইমামতিতে নারাজ ছিলেন না। এতে কেউ বিস্ময়ও প্রকাশ করেননি। মাত্র কয়েকজন কুরাইশি যুবক এ সম্পর্কে কিছু সমালোচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল যুবক হযরত উমর (রা.)-এর কড়া শাসন-ব্যবস্থার দরুন কিছু অসন্তুষ্ট ছিলো। তারা পরস্পরে বলতে লাগলো, দেখো! হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের ইমামতির ভার অর্পণ করলেন কুরাইশদের এক রুমী গোলাম সোহাইবের উপর।

এক ব্যক্তি বললো, খোদার শোকর যে, তিনি পরামর্শ-সভা কর্তৃক খলীফা নির্বাচন পর্যন্ত সোহাইবকে শুধু নামাযের ইমাম বানিয়ে ছিলেন। নতুবা ইচ্ছা করলে সোহাইবকে খলীফার নিজ প্রতিনিধি বানাতে পারতেন। তা তার ক্ষমতা-বহির্ভূত ছিলো না।

আর একজন বললো, তোমরা এসব কুভাবন ভেবো না। এতে অনেক সময় গুনাহ হয়ে থাকে। হযরত উমর (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে যুদানের এক গোলামকে কখনো মুসলমানদের খলীফা নির্বাচন করতেন না।

অন্য একজন বিদ্রুপ করে বললো, তোমরা কি এ কথা জান না যে, হযরত এক সময় বলেছিলেন, আবু উবায়দা বেঁচে থাকলে আমি তাকে খলীফা

বানাতাম। যদি আবু উবায়দার আজাদকৃত গোলাম সালেম জীবিত থাকতো, তবে আজ হয়তো তাকে আমার প্রতিনিধি নির্বাচন করতাম। তবে এখন বলো, এ সালেম কে ছিলো? ইস্তেখারবাসী এক ফার্সি গোলামই তো ছিলো। হযরত উমর (রা.) যখন এক ফার্সি গোলামকে খলীফা নির্বাচন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তখন একজন রুমী গোলামকে খলীফা নির্বাচিত করতে দোষ কি?

এক ব্যক্তি অতি রাগান্বিত হয়ে বললো, তোমরা পূর্বের অজ্ঞতার যুগের ন্যায় কথাবার্তা বলছো। তোমাদেরকে ধিক! তোমরা কি মুসলমান, না মুনাফেক? হযরত উমর (রা.)-এর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, আমরা তাকে অতি ন্যায়পরায়ণ, মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের একনিষ্ঠ ফরমাবরদার পেয়েছি।

স মা প্ত

ইমদাদ লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা